ষোলোজনের কলমে ভয়াল ভূতুড়ে উপন্যাস



পানিঝোরা কটেজ

ভূমিকা অনীশ দেব



পানিঝোরা কটেজ

ষোলোজনের কলমে ভয়াল ভূতুড়ে উপন্যাস

পানিঝোরা কটেজ

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
সৈকত মুখোপাধ্যায়
জয়দীপ চক্রবর্তী
জয়ন্ত দে
রাজা ভট্টাচার্য
চুমকি চট্টোপাধ্যায়
বিনোদ ঘোষাল
দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য
অভীক মুখোপাধ্যায়
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য
সাগরিকা রায়
দীপান্বিতা রায়
অভীক সরকার
দেবারতি মুখোপাধ্যায়
অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী
হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

পত্রভারতী

www.bookspatrabharati.com

পত্রভারতী

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২০
দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০২১

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

ভূমিকা অনীশ দেব
সম্পাদনা ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সৈকত মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

PANIJHORA COTTAGE
A thrilling horror novel
by Eminent 16 (Sixteen) Authors
Published by PATRA BHARATI® 3/1 College Row, Kolkata 700009
Phones +91-33-22411175, 9433075550, 9830806799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/Patra-Bharati-521504074559888

ISBN 978-81-8374-640-3

ষোলোকলায় অলৌকিক

আপনি এখন যে-বইটি হাতে নিয়ে দেখছেন সেটি এককথায় অনন্য। কারণ, 'পানিঝোরা কটেজ' শুধুমাত্র যে একটি অলৌকিক উপন্যাস, তা নয়। বরং তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু।

কেন, সেটা দেখা যাক।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন, বাংলা সাহিত্যে হরর কিংবা অলৌকিক উপন্যাস বলতে গেলে লেখাই হয়নি। যে একটি-দুটি চেষ্টা হয়েছে সেগুলো তেমন উল্লেখ করার মতো নয়। এরকম একটা পটভূমিতে দাঁড়িয়ে 'পানিঝোরা কটেজ' অবশ্যই ব্যতিক্রম। প্রথম কারণ, উপন্যাসটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০০০০ শব্দ, কিংবা তারও বেশি। দ্বিতীয় কারণ, এটি সৃষ্টি করছেন ষোলোজন লেখক যার মধ্যে অন্তত দশজন রীতিমতো নামী।

হলফ করে বলতে পারি, বাংলা সাহিত্যে এরকম আর কোনও নজির নেই। অলৌকিক বারোয়ারি (নাকি বলব, 'ষোলোয়ারি'?) উপন্যাস আগে কখনও লেখা হয়েছে না কি? আমার তো জানা নেই।

তা হলে বুঝতেই পারছেন, 'পানিঝোরা কটেজ' কেন অনন্য। এবং কেন এই অনন্য উপন্যাসটি আপনাকে পড়তেই হবে।

ডুয়ার্সের নির্জন ঘন জঙ্গলের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে পানিঝোরা কটেজ, যার আর-এক নাম রবার্টসাহেবের বাংলো। বাংলোটা প্রায় একশো বছরের পুরোনো। এর কাছাকাছিই রয়েছে কুখ্যাত বক্সা ফোর্ট। বৃটিশ আমলে এই ফোর্টে বন্দি ছিল ভারতের অনেক স্বাধীনতা যোদ্ধা। তাদের ওপরে নৃশংস অত্যাচার করত ব্রিটিশ কর্তারা। তারপর নকশাল আন্দোলনের সময়েও সেই অত্যাচারের ইতিহাস আবার ফিরে এসেছিল।

পানিঝোরা কটেজ এসবের প্রভাব থেকে রেহাই পায়নি। সেই পুরোনো সময়ে সেখানেও ঘটেছিল দুটি রুদ্ধশ্বাস বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা। অতীতের এইসব ভয়ংকর ঘটনার অভিশপ্ত ছায়া এসে পড়ে বর্তমানে।

দু-বন্ধু উৎপল আর অতীন বেড়াতে এসেছে বক্সার জঙ্গলে। তাদের থাকার আস্তানা 'পানিঝোরা কটেজ'। সেই সময় জেগে ওঠে অতীত। তাদের ঘিরে ধরে অলৌকিক অতীতের সর্বনাশা মেঘ। আনাগোনা করে নানান ছায়া আর কায়া। তারা কেউ জীবিত, আবার কেউ বা মৃত।

এইভাবে পরতে-পরতে রহস্যের জাল বুনে গড়ে উঠেছে 'পানিঝোরা কটেজ'। ষোলোজন কলম-শিল্পীর আন্তরিক চেষ্টায় তৈরি হয়েছে এই 'ষোলোয়ারি' অলৌকিক উপন্যাস। শুধু আপনার জন্য। তা হলে বলুন তো, এই উপন্যাস না পড়ে আপনি থাকতে পারবেন?

কলকাতা
২০ নভেম্বর ২০২০



সূচিপত্র





ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব

ফোর্টের ভাঙাচোরা গেটের ঠিক সামনে এসে উৎপল হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

কী রে! কী হল রে? দাঁড়িয়ে পড়লি?

উৎপল আমার দিকে ফিরে তাকাল। ওর মুখে ছড়িয়ে পড়েছে বিষণ্ণ হাসি, ঘোর লাগা দৃষ্টি যেন চলে গেছে বহুদূরে।

অতীন, এখানে এসে অদ্ভুত একটা ফিলিং হচ্ছে রে। ধরা গলায় উৎপল বলল, জানিস, এই—হ্যাঁ, এই বক্সাফোর্টেই আমার গঙ্গাদাদুকে...দাদুর মতো হাজার হাজার বিপ্লবীকে মাসের পর মাস আটকে রেখেছিল ইংরেজ শয়তানরা। সেলুলার জেলের পরে এটাই ছিল ভারতের সবচেয়ে খতরনাক ডিটেনশন ক্যাম্প। তখন এখানে এর চেয়ে অন্তত দশগুণ ঘন জঙ্গল ছিল। বাঘ, হায়েনা, লেপার্ড, ভালুক গিজগিজ করত জঙ্গলে। কত বিপ্লবী যে এখান থেকে পালাতে গিয়ে বাঘের মুখে পড়েছে, কেউ জানে না।...

গঙ্গাদাদু! মানে...মানে তোর সেই গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার?

হ্যাঁ রে অতীন। গঙ্গাচরণ চক্রবর্তী। আমার দাদুর মেজকাকা। দাদুও তাকে দেখেননি। মাত্র পনেরো বছর বয়েসেই বাড়ি ছেড়েছিলেন। অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। বাগমারির গোপন আস্তানা থেকে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেছিলেন।...তারপর তো মানিকতলা বোমা মামলায় ওনাকে জড়িয়ে দিল। তারপর সোজা এখানে চালান। ব্যস, তারপর আর খবর পায়নি বাড়ির কেউ। উৎপলের দীর্ঘশ্বাস পড়ল, চল, ঢুকে দেখি।

ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বিড়বিড় করে উঠল উৎপল, যা ব্বাবা! এ কী অবস্থা রে! পুরো খণ্ডহর। আগাছার জঙ্গল। জেলকুঠুরিগুলো সব ধ্বসে গেছে। কোনদিকে কয়েদিদের রাখত, কোথায় তাদেরকে নিয়ম করে পেটানো হতো, কোমরে দড়ি বেঁধে কাজ করাত, দাদুর কাছে শুনেছি এখানে লাইব্রেরিও নাকি ছিল...দ্যাখ, এমনকী একটা প্লাক...কারা কারা ওই আমলে কয়েদি ছিলেন...তার একটা লিস্ট পর্যন্ত নেই। অথচ আন্দামানে—

হ্যাঁ, আমি দেখে এসেছি। সেলুলার জেল এখন টুরিস্ট স্পট। চমৎকার মিউজিয়াম করেছে।

হ্যাঁ:! সাধে কি আর আমাদের বদনাম আছে, বাঙালি একটি আত্মবিস্মৃত জাতি। ভাবতে পারিস, কোথাও গঙ্গাদাদুর একটা ফটো অব্দি পাওয়া যায়নি? দাঁড়া, একখাবলা মাটি নিয়ে নিই। ওটুকুই নাহয় আমাদের কাছে দাদুর মেমোরি হিসেবে থাকুক।

কেন রে ভাই? পুলিশ রেকর্ডে দাদুর কোনও ছবি পাসনি? এখান থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে দাদু কোথায় গেছিলেন?

না রে অতীন। পুলিশ ফাইলে দাদুর শুধু নাম পেয়েছি, ছবি নেই। আসলে উনি তো ছাড়া পাননি। এই বক্সা জেল থেকে পালিয়েছিলেন। আরেক বিপ্লবী কৃষ্ণ চক্রবর্তীর সঙ্গে রাতের অন্ধকারে দুর্গের পাঁচিল টপকে পালান। পুলিশ ফাইলে শুধু কৃষ্ণর কথা আছে। কৃষ্ণ একা জলপাইগুড়ি অব্দি পৌঁছোন। রেল স্টেশনে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সোজা আন্দামানে চালান করে দেয় ব্রিটিশ। সেলুলার জেল থেকে ১৯৩৮ সালে ছাড়া পান কৃষ্ণ। কলকাতা ফেরেন। ব্যস, ওই পর্যন্ত। কৃষ্ণ চক্রবর্তীর চ্যাপ্টার খিদিরপুর ডকে নামার পরে ক্লোসড। তাঁরও আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উৎপল বলল, অথচ কী দুর্ভাগ্য বল, একমাত্র তিনিই বলতে পারতেন, গঙ্গাদাদু জলপাইগুড়ি পৌঁছতে পারেননি কেন? তাঁর কপালে শেষ অব্দি কী ঘটেছিল? ইংরেজরা তাকে ধরে

ফেলেছিল, নাকি তিনি এই জঙ্গলে বাঘের পেটে গেছিলেন? জানিস, দাদু নিজের মেজকাকার খবর নিতে বাবাকে আটাত্তর সালে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে! আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন?

কারণ কৃষ্ণ ছিলেন তখনকার মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর আপন দাদা। কিন্তু তিনিও দাদার খবর বলতে পারেননি। দাদা জেল খেটে আসার আগেই নৃপেনবাবু কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন।...না অতীন, আর থাকা ঠিক হবে না। সূর্য অনেকটা হেলে পড়েছে। আকাশে মেঘ জমছে, বাদলা হাওয়া দিচ্ছে।...আরে, আরে...ওটা—ককে ওখানে? অ্যাই, শুনছ?

কোথায় কে? চেঁচাচ্ছিস কেন?

আরে ভাই, ওই তো...একটা লোক...না, না ছেলে!...ওই পোড়ো বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছিল। আমি চিৎকার করতেই আস্তে করে ভেতরে ঢুকে গেল।

ধুৎ! যত সব উল্টোপাল্টা কথা। কী দেখতে কী দেখেছিস!

আরে ভাই, পষ্ট দেখেছি! বিলিভ মি। যাবে কোথায়? উৎপল গটমট করে এগিয়ে গেল।

ভগ্নস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা দুজনে। মাথান্যাড়া থাম-ফটক, উঁচু উঁচু জানলার আদল দেখে মনে হচ্ছে, কোনও এককালে হয়তো মস্তবড় পাকা বাড়ি ছিল। হয়তো এটাই ছিল জেলের সদর দপ্তর। এখন তার সারা গায়ে বট অশত্থ এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে জঙ্গল হয়ে আছে, বোঝার উপায় নেই।

নাহ, কোথাও কেউ নেই। চতুর্দিক নিস্তব্ধ, মাঝেমধ্যে দু-একটা পাখি ডেকে উঠছে। আকাশ আরও কালো হয়ে আসছে।

বললাম না, তোর চোখের ভুল!

হতেই পারে না! উৎপল গোঁয়ারের মতো মাথা নাড়ল, বিশ্বাস কর অতীন, আমি নিজের চোখে দেখেছি। ছেলেটা ঠিক এখানেই ছিল। ওর ভিতরে ঢুকে গেল।

ওকে, ওকে। বিশ্বাস করলাম। কিন্তু আর এগোনো ঠিক হবে না। ভিতরে সাপখোপের আস্তানা। যে-কোনও সময় বৃষ্টি নামবে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি চল।

ঘ্রাউ...ঘ্রাউ...ঘ্রাউ...উ...উ...! হঠাৎ একপাল কুকুর ডেকে উঠল। গাড়িতে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম।

একটু দূরে জঙ্গলের ঠিক বাইরে দশ বারোটা দিশি কুকুর। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চিৎকার করছে। ল্যাজগুলো খাড়া।

কাকে দেখে চিল্লাচ্ছে? এগুলো তো পাশের গ্রামের কুকুর। ওদের প্রতিপক্ষটা কে?

গাছপালার ফাঁক দিয়ে একটা বিশাল কালো অবয়ব, অল্প অল্প নড়াচড়া করছে। বনের মধ্যে প্রায় মিশে গেছে তার শরীর।

ভালুক! ভালুক নাকি রে? অ্যাই উৎপল?

হতেই পারে। উৎপল বলল, বাঘ এখন আর নেই বোধহয়। তবে ভালুক, চিতা, হায়েনা আছে বলে জানি। উঠে পড়।

গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে। কুকুরগুলো সমানে ডেকে যাচ্ছে। তবে মুশকো-কালো প্রাণীটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। জিগ্যেস করলাম, আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি রে?

কেন? তোকে বলেছি তো।

তোর সেই হোম-স্টে?

ইয়েস! মুহূর্তে উৎপল চনমন করে উঠল, পানিঝোরা কটেজ। আজ আমরা ওখানেই থাকব। গাড়িতে হার্ডলি দশ মিনিট। গুগল সার্চ করে দেখেছি, ওয়ান্ডারফুল লোকেশন।...রিকুং ভাইয়া, আপকো উও জাগা মালুম হ্যায় না?

পানিঝোরা বাংলা? লেপচা ড্রাইভার ঘাড় ঘুরিয়ে ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে তাকাল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, জি সাব, মালুম তো হ্যায়। লেকিন উস বাংলা আভি বিলকুল সান্নাটা, উধার কোই নেহি রহতা হ্যায়।

কী যে বলো! উৎপল তুড়ি মেরে ওর কথা উড়িয়ে দিল, গলত বাত! হাম কলকাত্তা সে বুক কিয়া। তুম আভি চলো তো। বুঝলি অতীন, আমি নিজে কটেজের ছবি দেখেছি। পাহাড়ের গায়ে, একেবারে ছবির মতো। কটেজের পাশ দিয়ে একটা দারুণ সুন্দর ঝরনা নেমেছে। আর ওখানে যদি কাউকে না পাই তো প্রবলেমটা কী? আমাদের সঙ্গে রাতে থাকার ফুল অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। শুকনো খাবার-দাবার যা আছে, দু-তিনদিন দিব্যি চলে যাবে। আমরা নিজেরা এনজয় করব।...রিকুং ভাইয়া, তুমি আমাদের নামিয়ে দিয়ে ব্যাক করে যাবে। ফেরার দিন তোমাকে ফোনে জানিয়ে দেব। কী বলিস অতীন?

ড্রাইভারের চোখ-মুখ আমার মোটেই সুবিধের ঠেকল না। আমতা আমতা করে বললাম, কিন্তু ভাই, জঙ্গলের মধ্যে একেবারে ফাঁকা বাংলো...মানে...রিকুং যা বলছে...

হাঃ-হাঃ-হাঃ! তুই ভয় পাচ্ছিস মনে হচ্ছে। উৎপল হেসে ওঠে, আরে ভাই, ওটাই তো বিউটি, জঙ্গলে থাকার আসল থ্রিল। কেউ কোত্থাও নেই...শুধু আমরা। রাতে জন্তুজানোয়ার নির্ঘাত ঝোরায় জল খেতে আসবে...অবশ্য...অবশ্য তুই মনে করলে ফিরে যেতে পারিস। আমি একাই থেকে যাব।

না না, কী যে বলিস! আমি কি তাই বললাম?

উৎপল আমার একেবারে ছোটবেলার বন্ধু। একসঙ্গে এক স্কুল, এক পাড়া। আমি স্কুলে পড়াই, উৎপল পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। আমাদের দুজনেরই একমাত্র নেশা পাহাড় আর জঙ্গল। উৎপলের ম্যাক্সিমাম ক্লায়েন্ট তাই ডুয়ার্স আর নর্থ ইস্টের টি গার্ডেনগুলো। মে মাসের মাঝামাঝি ও অডিটের কাজে বেরিয়ে পড়ে, আমি সঙ্গী। সেইসময় স্কুলে সামার ভেকেশন।

এবারে যেমন এসেছি রাজাভাতখাওয়ার হংসধ্বনি টি-এস্টেটে। বাগডোগরা এয়ারপোর্টে এস্টেটের গাড়ি আর লোক আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। তারপর এলাহি আপ্যায়ন, প্রতিবার যেমনটা হয়ে থাকে। টানা দু'দিন উৎপল অডিট করতে পড়ে ছিল ওদের ফাইল আর কম্পিউটারে। আমি তখন গার্ডেন ম্যানেজারের জিপ নিয়ে চিলাপাতা, জলদাপাড়ার জঙ্গল চষে ফেলেছি। উৎপল আগ্রহ দেখায়নি। কলকাতা থেকে আসার সময়েই ও বলেছিল, এবার ওর মেন ডেস্টিনেশন বক্সা জঙ্গল। তখন অবশ্য ওর গোপন উদ্দেশ্যটা বুঝিনি। এসব কিছুই বলেনি।

অতীন! উৎপল আস্তে আস্তে বলল, জানিস, কৃষ্ণ চক্রবর্তীও সম্পর্কে আমাদের জ্ঞাতি দাদু। ঢাকা বিক্রমপুরে পাশাপাশি বাড়ি ছিল আমাদের। বয়েসে গঙ্গাদাদুর প্রায় সমবয়েসি। দাদুর কাছে শুনেছি, উনিই গঙ্গা দাদুকে স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন।

সাব, আ গয়ে। দু'পাশের অপরূপ নিসর্গে ডুবে ছিলাম, রিকুংয়ের কথায় চটক ভাঙল। মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

ঘন সবুজ পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে একটা সাঁকোর ওপারে কটেজটা নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। পাশ দিয়ে ঝরঝর করে নেমে যাচ্ছে ঝরনার অবিশ্রান্ত জলধারা। ছোটবড় পাথরের ওপর আছড়ে পড়ছে। ফিনকি দিয়ে উঠছে জলবিন্দু। অপার নৈঃশব্দের বুকে শুধুমাত্র তারই শব্দ।

পানিঝোরা!!

দু'কামরার কটেজ। জানলা দরজা বন্ধ। উৎপল বারকয়েক জোরে জোরে হাঁক দিল, আরে ভাই, অন্দরমে কোই হ্যায়?...ভিতরে কেউ আছেন?

কোনও উত্তর এল না। আকাশ মেঘে মেঘে কালো। সন্ধের অন্ধকার দ্রুত ঘনিয়ে এসেছে। গায়ে টপটপ করে দু-চার ফোঁটা জল পড়ল।

রিকুং বলে উঠল, সাব। পহেলেই বোলে থে, ইয়ে বাংলা পুরা সান্নাটা হ্যায়। অব কেয়া করোগে?

অতীন, কুইক। উৎপল গাড়ির দিকে ছুটে গেল, আয়। লাগেজ নামিয়ে নিই। ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে। রিকুং, থ্যাংকিউ। তুমি চলে যেতে পারো।...

বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। উৎপল রুকস্যাক আর স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে তরতর করে কটেজের সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, পিছনে আমি। আমাদের গাড়িটা রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

আশ্চর্য! কটেজের দরজা স্রেফ ভেজানো ছিল, একটু ঠেলতেই খুলে গেল। উৎপল উল্লসিত, কী বলেছিলাম! দেখলি? আয়, ভেতরে ঢুকে আয়।

বাইরের নিকষ অন্ধকার ফালা ফালা করে দিচ্ছে কিলবিলে সাপের মতো বিদ্যুৎশিখা, ঘন ঘন বজ্রপাতে কানে তালা লেগে যাচ্ছে, উথালপাতাল ঝড়ের তাণ্ডব আর মুষলধারে বৃষ্টি!

কিন্তু—কিন্তু সাঁকো পেরিয়ে বাংলোয় উঠতে উঠতে...কে? কে ও?

আমি...আমি কি ভুল দেখলাম?

উৎপল! অ্যাই উৎপল!

কী?

তুই...তোর চোখে কিছু পড়ল?

কী! কী আবার পড়বে? পরক্ষণে ও আমার দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল, হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি। তুই ওই লোকটার কথা বলছিস তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু লোক না রে, আমার তো ছেলে মনে হল। ঝোরার পাশে পা ঝুলিয়ে বসেছিল। কিন্তু এই তুমুল বৃষ্টিতে বাইরে ওভাবে—

উৎপল আচমকা আমার হাত চেপে ধরল, অতীন, ঠিক ঠিক। এ এ তো সেই সেই ছেলেটা রে...যাকে আমি একটু আগে বক্সা ফোর্টে...

এই দ্যাখ! তুই এখনও সেই চোখের ভুলে আটকে আছিস। আরে ভাই, দ্যাখ, ও-ই হয়তো এই কটেজের কেয়ারটেকার। কিংবা তার ছেলেও হতে পারে। আমাদের আসার খবর পেয়ে বাবা না এসে ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছে। ছেলে বৃষ্টি এনজয় করছে। একটু পরে দেখবি, ও এসে সামনে দাঁড়াবে।

বলছিস? উৎপলের মতো সাহসী ছেলের গলাও একটু কেঁপে গেল, বাইরে বেরিয়ে একবার দেখব নাকি, ছেলেটা আছে কিনা?

খেপেছিস! এই কনকনে পাহাড়ি জল গায়ে লাগলে নিউমোনিয়া নির্ঘাত। কুল ডাউন মাই ফ্রেন্ড। দরজা আটকে দে, জল ঢুকছে। দুজন আছি, যা হবে সামলে নেব।

বলতে বলতে আমার গলাও কেঁপে গেল।



সৈকত মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পর্ব

কাঁধ থেকে লটবহরগুলো বারান্দায় নামিয়ে রেখে লাইটের সুইচটা অন করলাম। একপলক চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে অসুবিধে রইল না যে, বাংলো-প্যাটার্নের এই বাড়িটার বয়স একশো-বছরের কম নয়। হাতির পায়ের মতন মোটা-মোটা শালগাছের গুঁড়ির ফ্রেম আর কড়িবরগা। কাঠের দেয়াল, টালির ছাদ। এসব জিনিস বৃটিশ আমলে তৈরি হত, এখন আর হয় না।

পানিঝোরা নামের ঝরনাটা কটেজের ডান-পাশের পাহাড় বেয়ে নেমে এসেছে, তারপর তিস্তার বুকে ঝাঁপাবে বলে আবার রাইট-অ্যাঙ্গেলে একটা বাঁক নিয়ে বাংলোর সামনে দিয়ে তীব্রবেগে বয়ে গেছে পশ্চিমে। সেইজন্যেই রাস্তা থেকে বাংলোয় ঢোকার জন্যে প্রথমে আমাদের একটা সাঁকোর ওপর দিয়ে পানিঝোরাকে ক্রস করতে হল। তারপর প্রায় কুড়িধাপ সিঁড়ি ভেঙে, লন পেরিয়ে, বাংলোর ভেতরে ঢুকেছি।

ঢুকবার পথে প্রথমেই এই গ্রিলে ঘেরা দালান, যেখানে আমরা এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি। দালানের গায়েই পাশাপাশি দুটো ঘর। এই দুটো ঘরের দরজা খোলা দেখেই উৎপল অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল। অবাক হওয়ারই কথা অবশ্য। কারণ, শুধু যে দরজা-দুটোই খোলা তাই নয়, দালান আর ঘরের মেঝের দিকে তাকালেই বোঝা যাচ্ছিল, বহুদিন ঝাঁটপাটও পড়েনি। বাড়িটায় কি মানুষ নেই?

আমি আর উৎপল দুজনে পালা করে খানিকক্ষণ চেঁচালাম—কোই হ্যায়? গেস্ট আয়ে হ্যায় ভাইয়া, জারা শুনো তো ইধার। কিন্তু কোনও লাভ হল না। ইতোমধ্যে বৃষ্টির তোড় সপ্তমে উঠেছে। জলের চাদরের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে দূরের পাহাড় থেকে শুরু করে বাংলোর নিচে দিয়ে বয়ে চলা পানিঝোরার সবটাই। তারমধ্যেই আমরা দুজনে বারান্দা থেকে ঘাড় বাড়িয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করছিলাম, সেই ইয়ং ছেলেটাকে যদি দেখতে পাই—যে-ছেলেটা ঝোরার ধারে বসেছিল। ও নিজে যদি কেয়ারটেকার নাও হয়, কেয়ারটেকারের হদিশ তো দিতে পারত। কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পেলাম না।

উৎপল হতাশগলায় বলল, মনে হয় ব্যাটা সিকিমের ড্রাইভার-ফাইভার হবে। শিলিগুড়িতে ট্যুরিস্ট নামিয়ে ফেরার পথে ঝোরার ধারে সেলফি তুলতে এসেছিল। সেলফি তুলেই আবার কেটে পড়েছে।

আমি বললাম, অসম্ভব!

কেন?

দিব্যি বাঙালিদের মতন শ্যামলা গায়ের রঙ আর চোখা নাক মুখ। গায়ে খাকি কাপড়ের ঢোলা হাফপ্যান্ট, তার ওপরে লম্বা-লম্বা ডোরাকাটা বেঢপ এক জামা। সর্বোপরি খালি পা। ওটা পাহাড়ি ড্রাইভারের ড্রেস নয়, ভাই। তারা জিন্স, জ্যাকেট আর স্নিকার ছাড়া কিছু পরে না। সেইজন্যেই ভেবেছিলাম ছেলেটা এই হোম-স্টের কেয়ারটেকার।

উৎপল বলল, বাব্বা! ওইটুকু সময়ের মধ্যে এতকিছু লক্ষ করেছিলিস!

আমি বললাম, ভুলে যাস কেন, মাস্টারি করি? বছরের-পর-বছর গুচ্ছ-গুচ্ছ বিচ্ছুর সঙ্গে দিন কাটালে, খুঁটিয়ে দেখবার হ্যাবিট গ্রো করে যায়। এখন কথা হচ্ছে, সে কেয়ারটেকারই হোক, তার ছেলে কি ড্রাইভারই হোক, আমাদের কোনও উপকারে তো লাগল না। এবার আমরা কী করব?

উৎপল বলল, দাঁড়া। প্রথমে সিকিউরিটির ব্যবস্থাটা করে নিই। এই বলে ব্যাগ থেকে একটা শক্তপোক্ত আট-লিভারের তালা বার করে দালানের গ্রিলের দরজায় লাগিয়ে দিল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, একটা কাজ করি, বুঝলি অতীন। দুটো ঘর পরিষ্কার করতে গেলে অনেক খাটুনি পড়ে যাবে। তার চেয়ে এই বাঁদিকের ঘরটা একটু সাফসুতরো করে আজ রাতটা কাটিয়ে দিই। ডাবল-বেড রয়েছে। দুজনের শুতে অসুবিধে হবে না।

ওক্কে! আমি ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিলাম।

আমার পেছন-পেছন ঘরে ঢুকতে ঢুকতে উৎপল বলল, কাল সকালে দেখবি ওয়েদার ক্লিয়ার হয়ে গেছে, কেয়ারটেকারও চলে এসেছে। ব্যাস, আমাদের হলিডেও জমে ক্ষীর।

ঘর আর অ্যাটাচড টয়লেটের আলোগুলো জ্বেলে দিয়ে আমরা কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। এই আভিজাত্য আজকের কোনও বাড়িতে কল্পনাও করা যায় না। দেয়াল, মেঝে সবই বিশুদ্ধ পাইনকাঠের প্যানেল দিয়ে মোড়া। রাজকীয় সব বেতের ফার্নিচার, বয়সের ছোঁয়ায় যেগুলোর গায়ে হাতির দাঁতের মতন রঙ ধরেছে। আর এসবের সঙ্গেই মানানসই ভারী পর্দা, দামি বাথরুম ফিটিংস আর আলোর শেড।

শুধু...

শুধু সিলিংগুলো বড্ড উঁচু আর তাই সিলিং থেকে ঝোলানো একশো ওয়াটের বাল্বের আলো যেন মাঝপথেই হারিয়ে যাচ্ছে। ঘরের প্রত্যেকটা কোণে আর ফার্নিচারের পেছনে জমাট বেঁধে রয়েছে অন্ধকার। মনে হচ্ছে ছায়াগুলো যেন নড়াচড়া করছে। আমি এইসব ভাবতে-ভাবতেই উৎপল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, এই যাঃ যাঃ, হ্যাট হ্যাট। বেরো এখান থেকে।

চমকে উঠেছিলাম। ওকে জিগ্যেস করলাম, কীরে?

আরে, এই কালো কুকুরটা কখন ঢুকে পড়ল? হ্যাট হ্যাট! বেরো।

কোথায় কুকুর?

ওই তো। চেয়ারটার পেছনে।

আমি আমার মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইটটা অন করে, ও যে-চেয়ারটার দিকে দেখাচ্ছিল সেটার পেছনে আলো ফেললাম। হাসতে-হাসতে বললাম, ওই দ্যাখ তোর কুকুর।

চেয়ারের পেছনে একটা কালো পর্দার কাপড় দলা-পাকানো অবস্থায় পড়েছিল। উৎপল একটা হাঁফ ছেড়ে বলল, বাব্বা! রজ্জুতে সর্পভ্রম আর কাকে বলে। এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম না। কুকুর জিনিসটা আমার আবার মোটে সহ্য হয় না।

বৃষ্টি থামবার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। তার মধ্যেই একবার একটা জানলা অল্প ফাঁক করে পেছনের দিকে নজর চালালাম। দেখলাম, ওদিকেও কিছুটা ঘাসজমি। পুরো জমিটা ঘিরেই তারের বেড়া আর বেড়ার ওপাশ দিয়েই উঠে গেছে খাড়া পাহাড়। আরেকটা জিনিস দেখলাম। পেছনের ওই জমিতেই দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে টিনের চালের দু-কামরার দুটো পাকা ঘর। ওটা নিশ্চয় কিচেন এবং কেয়ারটেকারের আস্তানা। তবে আপাতত বাড়িটার সবকটা কাচের জানলাই অন্ধকার এবং একবার বিদ্যুৎ চমকাতেই দেখলাম দরজাতেও একটা বড়সড় তালা ঝুলছে।

জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে আমি একটা বেতের আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিলাম। বক্সা পাহাড়ে ওঠানামা করে বেশ টায়ার্ড লাগছিল। ভাবছিলাম, আধঘণ্টা একটু ঘুমিয়ে নেব। কিন্তু উৎপল মহা হাঙ্গামা শুরু করে দিল। আরে, এখন ঘুমোলে আর উঠতে পারবি? চল চল, হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে সঙ্গে যা আছে একটু খেয়ে নে; তারপরে একেবারে রাত্তিরের মতন শুয়ে পড়বি।

অগত্যা আমি ব্যাগটা খুললাম। চেঞ্জ করবার মতন পাজামা-পাঞ্জাবি, সাবান আর টাওয়েল, সব বার করতে হবে। উৎপল তাই দেখে বলল, এক কাজ করি। আমি পাশের ঘরের অ্যাটাচড বাথরুমটায় চলে যাই। এই বলে কাঁধে তোয়ালে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বড়জোর দু-মিনিট। আমি তখনও বাথরুমে ঢুকিনি। দরজার কাছ থেকে উৎপল ডাকল—অতীন, একটা জিনিস দেখে যা। ওর গলাটা যেন একটু কেঁপে গেল। আমি আর দেরি না করে ওর পেছন-পেছন পাশের ঘরে ঢুকলাম। না, ঢুকতে হল না। দরজার কাছে দাঁড়িয়েই উৎপল আঙুল দিয়ে মেঝের একটা অংশের দিকে দেখাল। বলল, ওগুলো দেখতে পাচ্ছিস?

হ্যাঁ। এই ঘরেও বালবের আলোটা কমজোরি, তবু সেই আলোতেই দেখতে পাচ্ছিলাম, মেঝেয় জমে-থাকা ধুলোর ওপরে একসারি পায়ের ছাপ। জুতো পরা পা নয়, খালি পায়ের ছাপ। একটু আগেই দরজা থেকে খাটের পাশ অবধি কেউ এগিয়ে গিয়েছিল, যাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। অথচ গ্রিলের গেট তালা দিয়ে বন্ধ। বন্ধ রয়েছে সমস্ত জানলাও।

আমি প্রথমেই উৎপলের পায়ের দিকে তাকালাম। ও যে ঘর থেকে বেরোনোর সময়েই পায়ে বাথরুম স্লিপার গলিয়ে বেরিয়েছিল, সেটা দেখেছিলাম। এখনো পায়ে সেই চটিই পরে রয়েছে। তাহলে খালি-পায়ের ছাপগুলো কার?

আমি বললাম, ওগুলো আগে থেকেই ছিল না তো রে?

উৎপল ঘাড় নাড়ল। বলল, না। আমি এই বাংলোয় ঢুকেই দুটো ঘরেরই দরজা খুলে দেখেছিলাম। তখন পায়ের ছাপগুলো ছিল না। আমি তোকে বলছি অতীন, দেয়ার ইজ সামথিং ভেরি ফিশি ইন দিস কটেজ। আই ক্যান স্মেল ইট।

'আই ক্যান স্মেল ইট'—এটা কথার কথা নয়! হঠাৎ করেই আমরা দুজনেই খুব বোঁটকা একটা গন্ধ পাচ্ছিলাম। মাংশাষী কোনও জন্তুর গায়ের গন্ধের মতন একটা গন্ধ।

আমি উৎপলের হাত ধরে টান দিলাম। বললাম, চল। ওই ঘরেই হাত-মুখ ধুয়ে নিবি। এই ঘরটা বন্ধই থাক।

উৎপলের মতন অদম্য ছেলেও দেখলাম বেশ দমে গেছে। বলল, তাই চল। কাল সকালে ভালো করে খুঁজে দেখতে হবে। মনে হয় ভাম-টাম কিছু একটা বাসা বেঁধেছে কোথাও। ডানদিকের ঘরটার দরজায় বাইরে থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়ে আমরা আবার বাঁদিকের ঘরটায় এসে বসলাম।

ঘড়ি দেখলাম, সাড়ে আটটা বেজে গেছে। এখনও একইরকম তেজে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। টিনের চালের ওপরে বৃষ্টির শব্দ, গাছের ডালপালার মধ্যে দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার শব্দ আর একদম আমাদের ঘরের পেছনেই পাথরের ওপরে লাফিয়ে পড়া পানিঝোরার জলপ্রপাতের মতন গুমগুম শব্দ, সব কিছু মিলিয়ে এমন একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছিল যে, আমরা দুজনে আর নিজেদের মধ্যে গল্প করতে পারছিলাম না। নিচু গলায় কাজের কথাগুলোই খালি বলছিলাম। সেইভাবেই ব্যাগ থেকে পাঁউরুটি আর জ্যাম বার করে, কাগজের প্লেটের ওপরে রেখে, নমোনমো করে কোনওরকমে রাতের খাওয়া সারলাম।

খাওয়ার পরে কী করা যায়, সেটাই হল সমস্যা। এমনিতে আমরা এত তাড়াতাড়ি ঘুমোই না। মোবাইলের টাওয়ার থাকলে হয়তো বাড়িতে ফোন-টোন করা যেত। কিম্বা ফেসবুক আর হোয়াটস্যাপে নোটিফিকেশন চেক করা যেত। কিন্তু সে গুড়ে তো বালি। অগত্যা দুজনে এটা-ওটা গল্পই করছিলাম। উৎপল বিছানার ওপরে পা ছড়িয়ে বসেছিল। আমি বসেছিলাম সেই বেতের আরামকেদারাটার ওপরে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের আলোচনায় বক্সা-ফোর্টের প্রসঙ্গ চলে এল। উৎপল বলল, যাই বলিস অতীন, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্পিরিটের কথা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়! কী-ই বা বয়স ছিল একেকজনের, বল? ওই বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোই অসীম সাহসে ব্রিটিশদের এগেনস্টে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল।

আমি বললাম, সত্যিই ভাবা যায় না। আমরা অনেকেই শুধু ফাঁসির কথা বলি। ফাঁসি তো ছিল আলটিমেট পানিশমেন্ট। তার আগে পেট থেকে কথা বার করার জন্যে যে কী বীভৎস অত্যাচার চালানো হত ওই কমবয়সি ছেলেমেয়েগুলোর ওপরে, তার কিছুটা জেনেছি উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' বইটা পড়ে। আন্দামানে সেলুলার জেলে বন্দিদের নারকোলের ছোবড়া পিটিয়ে কয়ার বার করতে হত। বড় বড় ফোসকায় ভরে যেত ওঁদের হাতের তালু। পশুর মতন ঘানিতে যুতে দিয়ে বলা হত, নারকোল পিষে তেল বার করো। না পারলেই চাবুক। বক্সাতেও নিশ্চয় অবস্থা তার চেয়ে খুব একটা ভালো ছিল না।

উৎপল আমার কথায় সায় দিল, নিশ্চয় ছিল না। অথচ বক্সার বন্দি বিপ্লবীদের মধ্যে ক'জনকে আমরা মনে রেখেছি বল?

ঠিক এই সময়েই বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে, পরিষ্কার একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ কানে এল। শব্দটা এল ঘরের ভেতরে, আমাদের খুব কাছ থেকেই। আমরা দুজনেই লাফিয়ে উঠলাম। চিৎকার করে উঠলাম, কে? কে?

উৎপলও ঘাবড়ে গিয়েছিল। তবে ওর নার্ভ আমার থেকে স্ট্রং। খুব তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল, অতীন! তোর মোবাইলের টর্চটা একটু ধর। আমি ঘরটা ভালো করে দেখি। সাপখোপ নেই তো? ওরকম বিদঘুটে আওয়াজ করল কে?

ঘরের টিমটিমে আলোর ওপরে আর ভরসা না করে, ফ্ল্যাশলাইটের জোরালো আলোয় খাটের নিচ, কাবার্ডের পেছন, বাথরুমের নালি সমস্তই ভালো করে দেখল উৎপল। সব দেখা শেষ করে ও যখন নিশ্চিন্ত হয়ে সবে বলছে, তার মানে আওয়াজটা বাইরে কোনও গাছের ডাল-টাল...তখনই আমার মোবাইলের আলোটা গিয়ে পড়ল সেই চেয়ারটার পেছনে।

নিজেই বুঝতে পারলাম আমার গলাটা কাঁপছে। কোনওরকমে ডাকলাম, উৎপল!

উৎপল কথা থামিয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। নিশ্চয় আমার মুখের ভাব দেখে ও কিছু বুঝেছিল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে আমার কাঁধটা চেপে ধরে বলল, কীরে? কী হয়েছে? এই অতীন! ওদিকে কী দেখছিস?

আমি বললাম, সেই কালো পর্দার কাপড়টা। ওটা তো নেই। কোথায় গেল?

উৎপলও অবাক গলায় বলল, তাই তো! গেল কোথায়? আমরা তো হাত দিইনি। তারপর ও হতভম্ব মুখে মোবাইলের আলোটা সামনে ধরেই চেয়ারটার দিকে এগিয়ে গেল। হাঁটু গেঁড়ে বসে খানিকক্ষণ মন দিয়ে কী যেন দেখে, ওখান থেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে ডাকল, একবার দেখে যা তো অতীন।

আমি এগিয়ে গেলাম।

দ্যাখ তো। এগুলো কোনও জন্তুর লোম বলে মনে হচ্ছে না?

দেখলাম। কোনও সন্দেহ নেই, ঘণ্টাখানেক আগে যেখানে প্রথমে উৎপল একটা কুকুরকে শুয়ে থাকতে দেখেছিল, তারপর আমার এই মোবাইলের আলোতেই যেখানে আমরা একটা কালো কাপড় পড়ে থাকতে দেখে হেসে উঠেছিলাম, সেখানেই এখন দলা দলা কালো লোম পড়ে রয়েছে। যেন একটু আগে ওখানে সত্যিই একটা কালো কুকুর শুয়েছিল।

উৎপল বিপর্যস্তমুখে উঠে দাঁড়াল। বলল, আমরা দুজনেই মনে হয় খুব ক্লান্ত, বুঝলি? সেইজন্যেই নানারকমের ভুলভাল দেখছি, শুনছি। যাকে বলে হ্যালুসিনেটরি-পারসেপশন। আমাদের রেস্ট দরকার। চল শুয়ে পড়ি।

আমি বললাম, হতে পারে। হয়তো কাল দিনের আলোয় এর সবকিছুরই একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। তবু আমরা দুজনে একসঙ্গে ঘুমোব না।

তাহলে? উৎপল জিগ্যেস করল।

পালা করে ঘুমোব। এবং ঘরের আলো জ্বলবে।

অন্য সময় হলে উৎপল এই শেষ কথাটা নিয়েই অবধারিতভাবে আমার পেছনে লাগত। কিন্তু এখন মেনে নিল। বলল, বেশ। আমি শুয়ে পড়ছি। তোর ঘুম পেলেই আমাকে ডেকে দিস।

এতক্ষণে বৃষ্টিটা একটু ধরেছে। আমি আরামকেদারাটায় গুছিয়ে বসলাম। নিউ-আলিপুরদুয়ার স্টেশনের হুইলারের স্টল থেকে একটা বিলিতি থ্রিলার কিনেছিলাম। এবার পড়ব বলে বইটা ব্যাগ থেকে বার করলাম। উৎপল বাথরুম থেকে ঘুরে এসে চাপাচুপি নিয়ে শুয়ে পড়ল এবং অবাক হয়ে দেখলাম, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়েও পড়ল। আমিও কিছুক্ষণের মধ্যে কাহিনির উত্তেজনায় ডুবে গেলাম।

এতই শান্তিতে ঘণ্টাগুলো কেটে গেল যে, আমার মনে হচ্ছিল বেকার জেগে বসে আছি। একবার কেবল মনে হয়েছিল বারান্দায় কে যেন হাঁটছে। কিন্তু আমার বরানগরের ফ্ল্যাটেও যখন কোনও কাজে রাত জাগি, তখনও ওরকম নানান শব্দটব্দ পাই। শব্দটা একটু বাদে নিজের থেকেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

যাই হোক, রাত যখন তিনটে, তখন দেখলাম আর জেগে থাকতে পারছি না। ঘন ঘন হাই উঠছে। ভাবছিলাম, উৎপলকে আর শুধুমুধু ডেকে তুলব না। দুজনে ঘুমিয়ে পড়লেও ক্ষতি নেই। কিন্তু তখনই উৎপল নিজেই উঠে বসল। দু-হাতে চোখটোখ কচলে বিছানা থেকে নেমে এল। বলল, যা, এবার তুই একটু ঘুমিয়ে নে।

আমি বললাম, তোর ওঠার দরকার নেই। তুইও ঘুমো।

উৎপল বলল, আমার ঘুম হয়ে গেছে। রাতে কোনওদিনই আমি চার-পাঁচ ঘণ্টার বেশি ঘুমোই না। আজ তো অনেক বেশিই ঘুমোলাম। এই বলে ও চেয়ারে এসে বসল। আমি ওর জায়গায় শুয়ে পড়লাম।

ক্লান্ত ছিলাম খুব। গাছের পাতা থেকে টুপ-টাপ জল পড়ার শব্দ শুনতে-শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। ঘুম ভাঙল উৎপলের ডাকে।

স্লিপিং ব্যাগের ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বুঝলাম, প্রথমত ভোর হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয়ত উৎপলের ডাকটা আসছে পেছনের বাগানের দিক থেকে। আমি সাড়া দিলাম, কী হল?

সর্বনাশ হয়ে গেছে রে অতীন! ঝোরাটা ওভার-ফ্লো করে পুলটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আমরা এখন স্ট্র্যান্ডেড। পেছনে খাদ, সামনে পাগলাঝোরা। দেখে যা শিগগির!

শিগগিরই যেতাম হয়তো, কিন্তু তখনই এমন একটা দৃশ্য দেখলাম যাতে আমার হাত-পায়ের সব জোর চলে গেল। ঝোড়ো হাওয়ায় ঘরের পর্দাটা একবার দুলে উঠল! সেই ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার দেখলাম, মেঝের অনেক ওপরে দোল খাচ্ছে দুটো পা! হাঁটু থেকে পায়ের পাতাদুটো দেখতে পাচ্ছিলাম। খালি পা, জুতো ছিল না। আর হাঁটুর কিছুটা নিচ অবধি নেমে এসেছে খাকি হাফপ্যান্টের ঘের।

পর্দাটা আরেকবার দুলে উঠতেই দেখলাম, কোথাও কিছু নেই।



জয়দীপ চক্রবর্তী

তৃতীয় পর্ব

উৎপল বাইরে থেকে আবার ডাক দিল, কী রে কী করছিস? তোর কি ঘুম ছাড়ছে না এখনও?

কেমন একটা অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে ছিলাম যেন এতক্ষণ। যেন ভয়ংকর একটা দুঃস্বপ্ন। কথা বলতে গিয়ে মনে হল যেন সব কথা হারিয়ে গেছে আমার। পাশের ঘর থেকে কিনা জানি না, একটা ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ এসে লাগছিল আমার কানে। যেন দীর্ঘদিন জমে থাকা হাহাকারের মতন শব্দ। ঘরের মধ্যে কি ঝড় ওঠে? উঠতে পারে কখনও? জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম আকাশ পরিষ্কার।

উৎপল আবার চিৎকার করে উঠল আমার নাম ধরে। ওর গলায় স্পষ্ট উদ্বেগ। বাইরে কোথায় যেন ভারী গলায় কুকুর ডেকে উঠল। আমার গভীর থেকে অন্য আমি বলে উঠল, আমার উৎপলের ডাকে সাড়া দেওয়া উচিত। নইলে ও বেচারা...

যাচ্ছি, বলতে গিয়েও প্রথমটা আওয়াজ বেরোল না গলা থেকে। গলার কাছটা আঠার মতন চ্যাটচেটে! ঘর থেকে বারান্দায় বেরোবার পর্দাটার দিকে আরো একবার তাকালাম ভয়ে ভয়ে। পর্দাটা স্থির হয়ে আছে। দুলছে না আর এখন। উৎপলের কাছে যেতে গেলে ওই পর্দা সরিয়েই বারান্দায় যেতে হবে আমাকে। আর ওই বারান্দাতেই সিলিং থেকে গলায় দড়ি দিয়ে কে একজন ঝুলছিল একটু আগে। বুকের মধ্যেটা ভয়ে ছ্যাৎ করে উঠল আমার।

বারান্দা থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের দিকে। কিন্তু এই ঘর থেকে বারান্দায় যাবার দরজায় ঝোলানো পর্দাটার ওপারেই তো...আমি জানি আমার দেখায় ভুল ছিল না। কিন্তু কেউ কি বিশ্বাস করবে আমার কথা? উৎপলও হয়তো হেসে উড়িয়ে দেবে। আর ওকে দোষই বা দিই কী করে?

বাইরে আকাশ এখন পরিষ্কার। ঝলমলে রোদ্দুরও উঠেছে। তবু ভীষণ শীত করতে লাগল আমার। দুলে ওঠা পর্দার ওদিকের সেই ঝুলন্ত পাদুটো যেন এখনও চোখের সামনে ভাসছে। অমন অসম্ভব একটা দৃশ্য কেন দেখলাম? যা দেখলাম তার সবটাই আমার চোখের ভুল বলে উড়িয়ে দিতে পারে উৎপল। কিন্তু কাল রাতের পায়ের ছাপ? সেটা তো মিথ্যে নয়।

আমি ভীতু নই। তবু এই দিনের বেলাতেও দরজার দিকে এগোতে পারছিলাম না আমি। মনে হচ্ছিল পর্দা সরিয়ে বাইরে বেরোতে গেলেই ওঁৎ পেতে থাকা নতুন আতঙ্ক আমার ঘাড়ের ওপরে এসে লাফিয়ে পড়বে।

দেওয়ালে একটা টিকটিকি এতক্ষণ স্থির হয়ে বসেছিল। মরা না জ্যান্ত বোঝা যাচ্ছিল না। আমি উঠে দরজার দিকে পা বাড়াতেই বিচ্ছিরি শব্দ করে সেটা ডাকতে শুরু করল। একটু আগে শোনা কুকুরের গম্ভীর ভোউ-ভোউ গর্জনটা আবার কানে এল বাইরে থেকে।

উৎপলের ওপরে রাগ হচ্ছিল। ওর সবেতেই বাড়াবাড়ি। সরাসরি না বললেও রিকুং তার হাবে-ভাবে কালই বুঝিয়ে দিয়েছিল জায়গাটা গোলমেলে। তারপরেও অতিরিক্ত সাহস দেখিয়ে এখানে থেকে যাওয়াটা একেবারেই উচিত হয়নি আমাদের।

বারান্দায় যাবার দরজার পর্দা সন্তর্পণে সরালাম। প্রথমে ছাদের দিকে, তারপরেই পাশের বন্ধ ঘরের দরজার ওপরে চোখ রাখলাম। অকারণ অস্বস্তি হতে লাগল বুকের ভেতরে। এই ঘরের মধ্যেই কাল পায়ের ছাপ দেখেছিলাম। একটা বিচ্ছিরি পচা গন্ধও লাফিয়ে এসে পড়েছিল আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়র ওপরে। মর্গের ভেতরে ঢুকলে যেমন গন্ধ পাওয়া যায় অনেকটা তেমন গন্ধ। রাতে শোবার সময় কথাটা পাড়তেই হো হো করে হেসে উঠেছিল উৎপল। আমার পিঠে চাপড় মেরে বলেছিল, এই পরিত্যক্ত পানিঝোরা কটেজে ডেডবডি-ফডি লুকিয়ে রাখা আছে বলছিস?

আমি কিছুই বলছি না! একটু বিরক্ত হয়েই বলেছিলাম, কিন্তু একটা চিমসে গন্ধ নাকে এসে লেগেছিল। গন্ধটা আমার চেনা। কেমন যেন মৃত্যুর গন্ধ...

মৃত্যুরও গন্ধ থাকে নাকি?

থাকে। তুইও জানিস।

উৎপল আবার হেসে ওঠে, দেখ অতীন, আমি ঠিক এই থ্রিলটাই চাইছিলাম। এই বয়েসে আর যাই হোক, ভূতের ভয় পাবি না তুই। আমি তো অন্তত পাবই না। বরং পানিঝোরা কটেজের নির্জনতার মধ্যে বসে শুয়ে আয়েস করে এই ভূতুড়ে অ্যাম্বিয়েন্সটা চুটিয়ে উপভোগ করব ক'টা দিন...!

তুই যতই ব্যাপারটা হাল্কাভাবে নিস উৎপল, আমার স্থির ধারণা এই কটেজে কিছু একটা রহস্য আছে। অন্তত রিকুংয়ের কথাবার্তায় তার স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। আমার স্থির ধারণা রিকুং এই কটেজে কী বিপদ হতে পারে সে সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। এবং সেইজন্যেই আমাদের এখানে আসার ব্যাপারে প্রাণপণ বাধা দিয়ে যাচ্ছিল সারাটা রাস্তা ধরে। রিকুং লোকাল ছেলে। ওর কথা শোনা আমাদের উচিত ছিল...।

শোন অতীন, পাহাড়ের লোকগুলো বেজায় সাহসী এবং কর্মঠ হলেও অসম্ভব সুপারস্টিশাস...

এখন হয়তো আমার কথাগুলো উড়িয়ে দিচ্ছিস, কিন্তু পরে এর জন্যেই না আমাদের পস্তাতে হয় দেখিস...। খানিকটা বিরক্ত হয়েই বলি আমি, সাহস ভালো। কিন্তু হঠকারিতা ভালো নয়।

'ঠিকই বলিয়াছিলে বন্ধুকে ইয়াং ম্যান।', একটা জড়ানো কণ্ঠস্বর বিকৃত বাংলা উচ্চারণে বলে উঠল আমার ঠিক পিছন থেকে, 'এই কথাই তোমাদের বলিয়াছিলাম একসময়। সাহস অতি উত্তম বস্টু! লেকিন দুঃসাহস বহট খারাপ চিজ আছে...'

আমি চমকে পিছন ফিরলাম। কিন্তু কাউকেই চোখে পড়ল না। বন্ধ দরজার পাল্লার ওপরে লাগানো লোহার কড়াদুটো শুধু খটখট আওয়াজ করে দুলছিল তখনও...।

বাইরের বারান্দা থেকে তক্ষুনি একটা চাপা গরর-গরর, আওয়াজ উঠল। আমি ভয় পেয়ে আবার ঢুকে পড়লাম ঘরের মধ্যে। আমার হাত পা থরথর করে কাঁপছে। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস ধড়াস করছে। মাথার মধ্যেটাও ক্রমশ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। আমি কি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি?

এই অতীন! তোর মোবাইলে টাওয়ার আছে? উৎপলের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম আমি।

ঘরের পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুকেছে উৎপল। দ্রুত দৌড়ে গেলাম আমি ওর দিকে। কিন্তু উৎপলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমি থমকে গেলাম। এ কাকে দেখছি? উৎপলের মুখটা অচেনা মনে হচ্ছে কেন? এ যেন অন্য কারও মুখ। কার? সে-ও অনেক কালের চেনা আমার। কিন্তু সে যে কে, কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

অমন ফ্যালফ্যাল করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে দু-হাত দিয়ে আমার দু-কাঁধ ধরে জোরসে ঝাঁকুনি দিল উৎপল। উৎকণ্ঠিত গলায় জিগ্যেস করল, কী হয়েছে তোর?

আমি ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললাম, তুই—তুই-ই উৎপল?

কী! কী আবোলতাবোল বকছিস? উৎপল আমার মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়ল। তারপর অবাক হয়ে বলে উঠল, তোর কী হয়েছে অতীন?

তুই এখানে...কিছু...কিছু অস্বাভাবিক দেখছিস না উৎপল?

উৎপল চুপ করে রইল।

আমি আবার বলতে শুরু করলাম, কাল থেকেই আমাদের অজান্তে কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে এখানে। আমি বার বার সেই ঘটনার ঢেউ ফিল করতে পারছি! কিন্তু বুঝতে পারছি না ঠিক কী ঘটছে এখানে।

বি স্টেডি অতীন। উৎপল আমার দু-কাঁধ চেপে ধরল, নিজেকে শক্ত কর। এতখানি দুর্বল হয়ে পড়লে মুশকিল। আমাদের ক'দিন থাকতে হবে এখানে...।

ওর কথার জবাব না দিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় জিগ্যেস করলাম, তুই এই বারান্দা দিয়েই ঘরে এলি তো?

উৎপল হেসে ফেলল, হ্যাঁ। এ ছাড়া আর কোথা দিয়ে ঢুকব? ঘরে ঢোকার রাস্তা তো একটাই।

বারান্দায় কিছু চোখে পড়ল না তোর?

কী চোখে পড়বে?

কিচ্ছু দেখতে পেলি না তুই?

না তো!

শুনতেও কিছু পেলি না?

উঁহু। উৎপল চোখ কুঁচকে আমার দিকে চাইল, কী হয়েছে? কী দেখেছিস তুই স্পষ্ট করে বল তো আমাকে অতীন? তোকে দেখে আমার মোটেই ভালো লাগছে না...'

তুই যখন আমাকে ডাকলি, আমি স্পষ্ট দেখলাম পর্দার ওদিকে, বারান্দার সিলিং থেকে একজন ঝুলছে। ঘর থেকে শুধু পাদুটো চোখে পড়েছিল। জুতো ছাড়া দুটো পা। পরনে খাকি হাফ প্যান্ট...

উৎপল কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। বলল, এখন দুর্বল হলে চলবে না। সামনে আরও বড় বিপদ আসতে পারে। বাইরে আলোয় আয় আগে। উৎপল হ্যাঁচকা টান মারে, মানুষ সাধারণত অন্ধকারকে ভয় পায়। কেন পায় জানিস? অন্ধকারে সত্যিটাকে দেখা যায় না স্পষ্ট করে।

ঘর থেকে পর্দা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ল না। পানিঝোরা কটেজের চারপাশ একইরকম নিরুদ্বেগে সেজেগুজে অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্যে। নীল আকাশের দিকে চেয়ে ভালো লাগছিল। উৎপল ঠিকই বলছিল একটু আগে। অন্ধকার কেটে গেলে ভয় ফিকে হয়ে যায়। মনের বিচ্ছিরি অস্বস্তিটা কেটে যাচ্ছিল।

ঝলমলে রোদ উঠেছে। সঙ্গে যা খাবার আছে তাই দিয়ে হাল্কা ব্রেকফাস্ট করেই বেরিয়ে পড়া যাবে এখান থেকে। রিকুংকে ফোন করে ডেকে নিতে হবে সময়মতন।

কাল রাতে ভালো করে দেখা হয়নি চারপাশটা। আজ ফিরে যাবার আগে হেঁটে হেঁটে চারপাশটা দেখছিলাম। আর তখনই ব্যাপারটা চোখে পড়ল আমার—

কটেজের চারদিকটা ফাঁকা, শুনশান। ঝলমলে রোদ্দুর মেখে দূরে দূরে জঙ্গলে শরীর ঢেকে পাঁচিলের মতন দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের দল। কাল যেমন করে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবেই। পার্থক্য একটাই—কাল রাতে বৃষ্টিতে ভিজে পাগলা ঝোরাটা আরো একটু বেশি মত্ত হয়েছে। যে কাঠের সাঁকোটা পেরিয়ে এই জনমানবহীন, পরিত্যক্ত পানিঝোরা কটেজে এসে ঢুকেছিলাম কাল সন্ধেবেলা, সেই সাঁকোটাকে ভাসিয়ে দিয়ে একটানা গান গেয়ে চলেছে সে। সাঁকোটার পরিণতি দেখে মনে যে সাহসটুকু এসেছিল, কর্পূরের মতন তা উবে গেল।

আমি ঘাবড়ে যাওয়া গলায় জিগ্যেস করলাম, উৎপল! সাঁকোটা তো কাল রাতের বৃষ্টিতে ভেসে গেছে। এইবার ফিরব কী করে?

হ্যাঁ রে! উৎপল বলল, এখানে যে একটা কেয়ারটেকারও পাব না, কী করে বুঝব বল? এখন আর তো কোনও উপায় নেই। দু-একদিন এখানে আমাদের থাকতেই হবে। রিকুংকে খবর পাঠিয়ে সাঁকোটা মেরামত না করানো পর্যন্ত...।

ফোন করেছিস রিকুংকে?

আমার ফোনে নেটওয়ার্ক নেই সকাল থেকে। উৎপল হতাশ গলায় বলল, ওইজন্যেই তো তোকে জিগ্যেস করছিলাম। যদি তোর ফোনে...

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ফোন বের করলাম আমি। নাহ! আমার ফোনও মৃত।

এখন উপায়? উৎপলের মতন ডাকাবুকো ছেলেও মাথা নেড়ে বলল, কাল রাতে যা ঝড় বৃষ্টি হয়েছে, টাওয়ার-ফাওয়ার ঠিক হতে কতদিন লাগবে কে জানে! আমাদের হাতে যেটুকু শুকনো খাবার আছে তা দিয়ে বড়জোর দিন দুই-তিন চালিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু তারপর...?

জায়গাটা সত্যিই ভালো নয়। একটা কিছু সমস্যা আছেই আছে এখানে। একমুহূর্তও আর এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না উৎপল।

না থেকে উপায়ও তো নেই অতীন...কথা শেষ না করেই থমকে গেল উৎপল! আমার বুকের মধ্যেও ধড়াস করে উঠল।

একটু আগেও ঝকঝকে রোদ্দুর ছিল। একখণ্ড ফ্যাকাশে মেঘ এসে হঠাৎই সেই রোদ ঢেকে দিল। ঝোরার দিক থেকে দমকা জোলো হাওয়া এসে লাগল আমাদের গায়ে। কাঁপা গলায় উৎপলকে বললাম, অন্ধকারে আবার আলো ঢেকে গেল রে উৎপল...

এই অন্ধকারকে যে করেই হোক অতিক্রম করতে হবে আমাদের, উৎপল ভরসা দিল, ঠিক কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে দেখিস...।

হাওয়ার দাপট বাড়ছিল। শীত করতে শুরু করল। কুকুরটা ডাকতে শুরু করল আবার। উৎপল বলল, কোত্থেকে ডাকছে বল তো?

দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু মনে হচ্ছে কাছেই।

টুপটাপ বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করল।

উৎপল আকাশের দিকে তাকিয়ে হতাশ গলায় বলল, পুরো আকাশটাই যে ফের বুজে গেল রে অতীন। মনে হচ্ছে ভারী বৃষ্টি নামবে।

চল ঘরে যাই। আমি লম্বা লম্বা পা ফেললাম কটেজের দিকে। উৎপল আমার পাশেই। সিঁড়ি দিয়ে কটেজের বারান্দায় উঠেই আমরা থামলাম। উৎপলের ভুরু কুঁচকে গেছে। বন্ধ ঘরটার দরজার ওপাশে শব্দটা স্পষ্ট।

ঘরের মধ্যে কারা যেন হাঁটছে। ভারী বুটের ছন্দবদ্ধ হাঁটা। খট খট খট... কে একটা চেঁচিয়ে উঠল, 'হল্ট!'

বুটের শব্দও থেমে গেল। এখন ঘরের মধ্যে অন্য রকম আওয়াজ। কে বা কারা যেন কী একটা ভারী জিনিস টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে ঘরের মেঝের ওপর দিয়ে। একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দও যেন শুনলাম মনে হল। ক্ষীণ আর্তনাদ। তারপরেই সেই অসহায় আর্তনাদ ছাপিয়ে সপাং সপাং করে চাবুকের শব্দ শুরু হল ঘরের মধ্যে।

আমার শরীর জোড়া শিরশিরে ভয়ের অনুভূতিটা ফিরে আসছে। উৎপল বলল, চল তো দেখি...।

এসবের মধ্যে ঢোকা কি ঠিক হবে? আমি ওকে থামাবার চেষ্টা করি।

কেউ আমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে অতীন।

এই দুর্যোগের মধ্যে কে আমাদের ভয় দেখাতে আসবে উৎপল?

সেইটাই তো দেখতে চাইছি। গোঁয়ারের মতন গলায় বলে উঠল উৎপল, এই কটেজে সত্যিই যদি কিছু রহস্য থাকে তার সমাধান করেই যাব আমি এখান থেকে...।

গায়ের জোরে সব কিছু হয় না উৎপল!

তুই বরং ঘরে চলে যা অতীন।

তা হয় না। আমি এইবার ঘুরে দাঁড়াই, তোকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকব ততটা কাপুরুষ আমি নই।

তাহলে চল। ভয় না পেয়ে দুজনে একসঙ্গে বুক চিতিয়ে বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াই।

আমরা বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ততক্ষণে সব আওয়াজ থেমে গিয়ে আবার নিঃঝুম হয়ে গেছে পানিঝোরা কটেজ। চার-পাঁচটা চামচিকে এই দিনের বেলাতেও ফর ফর করে উড়ে এল কোত্থেকে। আমাদের মাথার ওপর পাক খেতে লাগল বৃত্তাকারে।

উৎপল বলল, চল, দরজা খুলে ঘরে ঢুকি।

যেই না হাত ছুঁইয়েছি, অমনি পিছন থেকে কে যেন ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলে উঠল, বন্ধ দরজা কি একটা গো? কত দরজা খুলবে তোমরা? আর চাইলেই কি সব বন্ধ দরজা হাট করে খুলে ফেলা যায়? মনে রেখো, সব বন্ধ দরজা খুলতে নেই। এ পৃথিবীর কিছু রহস্য দরজার আড়ালেই থেকে যায় চিরকাল। আর সে রহস্য আড়ালে থাকাই ভালো...।

চমকে ফিরে দেখলাম সেই ছেলেটা। কাল ঝোরার ধারে যে একা বসেছিল। রোগা, একহারা শ্যামলা যুবক। পায়ে জুতো নেই।

ছেলেটা মুখে অদ্ভুত বাঁকা হাসি নিয়ে চেয়েছিল আমাদের দিকে। ওর চোখদুটো অন্যরকম! ধারালো! আগুনে! তীক্ষ্ণ! আজও ওর পরনে সেই খাকি হাফ প্যান্ট।

প্যান্টটার দিকে চোখ পড়তেই গা শিউরে উঠল আমার।



জয়ন্ত দে

চতুর্থ পর্ব

উৎপল ছেলেটাকে দেখে হাতে যেন চাঁদ পেল। একটু গলা খাকারি দিয়ে বলল, এই তো, তোমাকেই খুঁজছিলাম।

উৎপলের কথায় ছেলেটা সোজা হয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কাল বিকেলে একেই দেখেছিলাম ঝোরার পাশে, সেই খাকি ঢোলা প্যান্ট, আর লম্বা লম্বা ডোরাকাটা জামা।

ছেলেটা সামনে দাঁড়িয়ে, কিন্তু আধো আলোছায়ায় আমার মনে হল ও আমাদের কাছে থেকেও বেশ দূরে। আমাদের মধ্যে অনেকখানি তফাত।

আমি চোখ কচলালাম। ফিরে চোখের পাওয়ারটা চেক করাতে হবে!

কাল সন্ধেবেলা আমরা এসেছি। তোমাদের কাউকেই তো পেলাম না। কোথায় ছিলে ভাই? উৎপল গলা ছেড়ে কথাগুলো বলল।

ছেলেটা বিশুদ্ধ বাংলায় জবাব দিল, এই তো, এখানেই ছিলাম।

আমার মনে হওয়াটা তাহলে ঠিকই আছে। ছেলেটা বাঙালি। বাঙালি জেনে, কেন জানি না, আমার একটু শান্তি হল। যাক গে, সহজভাবে কথা বলা যাবে।

এখানেই ছিলে! স্ট্রেঞ্জ! কাল এত ডাকাডাকি করলাম, শোনোনি? তুমি কি কেয়ারটেকার? উৎপল বলল।

না।

তাহলে? কেয়ারটেকার কোথায়?

আসবে।

ছেলেটার উত্তর শুনে উৎপল কেমন যেন রিল্যাক্সড হয়ে আমার দিকে তাকাল। ভাবটা এমন, দ্যাখ, আমরা কত ফালতু চিন্তা করছিলাম। ওই তো কেয়ারটেকার আসবে। তাহলে এটা নিশ্চয়ই পরিত্যক্ত কটেজ নয়।

কটেজটা হয়তো পরিত্যক্ত নয়, মানলাম। কিন্তু এটা কেমন, এত বড় একটা সাজানো গোছানো কটেজ মানুষজন ছাড়া পড়ে আছে! একটুও আশ্চর্য লাগছে না? হয়তো উৎপল সোজাসাপটা দেখে, কিংবা ওর বিস্ময়বোধ কম।

ততক্ষণে আমার ভেতরটা উতলা হচ্ছে, কেয়ারটেকার কখন আসবে? সত্যিই আসবে তো? ছেলেটা ঠিক জানে?

উৎপল যেন আমার ভাবা কথাটাই শুনতে পেল।

আসবে তো জানি। তা কখন আসবে? উৎপল এবার গলা ভারী করে কথাটা জিগ্যেস করল।

সময়মতো এসে যাবে। ছেলেটা খুব ঠান্ডা গলায় জবাব দিল। ও এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে আর দু-হাত ঘষে চলেছে।

এটা একটা উত্তর হল? ব্রিজটা ভাঙা, মোবাইলে টাওয়ার নেই। আমরা একটু হলেও টেনশনে আছি, কখন এই কটেজের কেয়ারটেকার নিজের সময়মতো আসবে! অদ্ভুত তো ছেলেটা!

উৎপল বলল, তা তুমি? তুমি কে?

আমি কেউ না। আমি এমনি আসি। এখন এসেছিলাম আমার কুকুরটাকে খুঁজতে।

এখানে কুকুর খুঁজতে এসেছে, তাহলে কি ছেলেটার বাড়ি কাছাকাছি? আমি কিন্তু ছেলেটার দিকেই তাকানোর চেষ্টা করছি। আর ছেলেটা বারবার আমার চোখে কেমন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। এত কাছে দাঁড়িয়ে

কাউকে যদি ঝাপসা লাগে—না, ফিরে গিয়ে সত্যিই আগে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। চোখের পাওয়ারটা চেক না করলে আর চলবে না। কাল সারারাত সেভাবে ঘুম হয়নি। কেমন যেন একটা আনক্যানি ফিলিং ভর করেছিল আমার ওপর। আমি উৎপলকে কিছু বলিনি, অস্বস্তিটা নিজের ভেতর রেখে বিছানায় মুখ চেপে শুয়েছিলাম। কোনওভাবে রাতটা কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, ঘুমিয়েও পড়েছিলাম কখন।

আমার সাতপাঁচ ভাবনার ভেতর হঠাৎ ছেলেটা হাঁটতে শুরু করল। ওর হাঁটার ভঙ্গির মধ্যে কেমন একটা অগ্রাহ্য করা ভাব। আমরা যে দাঁড়িয়ে আছি, ওর সঙ্গে কথা বলছি, ও তোয়াক্কাই করছে না।

তুমি ভাই লোকজন দেখো। ব্রিজটা সারানোর একটা ব্যবস্থা করো। একনিঃশ্বাসে উৎপল কথাগুলো বলল।

আরে! ও কুকুর খুঁজতে এসেছে! ও কি লোকজন জোগাড় করবে, ব্রিজ সারানোর ব্যবস্থা করবে—উৎপল কি প্রথম মানুষ দেখে সব কথাই বলে দিতে চায়—আমি উৎপলের দিকে তাকালাম, কিন্তু ওর ভুল ধরালাম না। এই ছেলেটাকেই হয়তো উৎপল অন্ধের যষ্ঠি ভাবছে!

আর চা-কফি কিছু মিলবে? উৎপল গলা পাল্টে নরম স্বরে জানতে চাইল।

ছেলেটা চলে যেতে যেতে বলল, পিছনদিকে কিচেন আছে, যান সব পেয়ে যাবেন।

কথাটা শুনেই উৎপল আমার দিকে তাকাল। হঠাৎ ওর মুখে কেমন আলো খেলা করে গেল। দু-হাতে মুখ মুছে বলল, চল ঘরে চল। কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। আশা করি ততক্ষণে কেয়ারটেকার মালটা এসে পড়বে।

কথাটা বলেই উৎপল একটু থামল। এক নিমেষে কিছু একটা ভাবল, বলল, বুঝলি, চালে একটু ভুল হয়ে গেল। এই ছেলেটাকেই শ'খানেক টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে আটকে রাখলে হত, চা-টা করে দিত। কোন দিকে গেল বল তো ছেলেটা? ঝোরার দিকে, না জঙ্গলের দিকে?

আমি হ্যাঁ না কিছু বলার আগেই ঝড়ের বেগে উৎপল ছেলেটার খোঁজে বেরিয়ে গেল।

কাঠের লম্বা বারান্দা পেরিয়ে উৎপল ঝোরার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি ওর চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে আছি। নুড়ি পাথর ফেলা পথ, দু-ধারে মাথা ঝোঁকানো আগাছা সে পথকে ঢেকে দিয়েছে। কটেজের সামনে আবার যেন ঠিক সামনে নয়, ডানদিকে বাঁক নিয়ে পানিঝোরা।

মুহূর্তে উৎপল আড়াল হয়ে গেল।

দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ঝোরার গর্জন অনেক কম মনে হচ্ছে। সকালবেলা ঘুম ভেঙে ছিল হরেকরকম পাখির ডাকে। কাল এক অচেনা আতঙ্কে রাত কেটেছে। একটা অদ্ভুত অনুভূতি। কেন যে এমন মনে হয়েছিল রাতে, কী সব ভুলভাল! মানুষের মনের ভুল কত দিকবিদিকে ছুটিয়ে মারে।

তীব্র সবুজের গন্ধ বাতাসে খেলা করছে। তারই সঙ্গে মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় উড়ে আসছে ধুলো ধুলো জলের কণা। চারদিকটা বড় স্যাঁতসেঁতে। কালও দেখেছি, আজও দেখেছি, নুড়ি পাথর, ঘাস জমিতে অজস্র জোঁকের লাফালাফি।

তবে জায়গাটা বেশ। চারিদিকে ঘন সবুজ পাহাড়। সরু ফিতের মতো রাস্তা। কাল ওই রাস্তা ধরে পাহাড় টপকে টপকে আমরা এসেছিলাম এই পানিঝোরা কটেজে। কটেজটা কি সত্যি সত্যি পরিত্যক্ত? না, না, পরিত্যক্ত কেন হবে, হয়তো এখন ট্যুরিস্ট আসার সময় নয় বলে এ অবস্থায় পড়ে আছে। ছেলেটা বলল, 'পিছনের কিচেনে সব আছে।'

সব যদি থাকে কটেজটা তাহলে পরিত্যক্ত কী করে হয়! আমি নিজেকে নিজের যুক্তি দিয়েই খণ্ডন করছি।

উৎপল আসুক ছেলেটাকে খুঁজে নিয়ে। যতক্ষণ কেয়ারটেকার না-আসে ততক্ষণ ছেলেটাই আমাদের কেয়ারটেকার হোক। আচ্ছা, ওর কাছে কি মোবাইল আছে? আমাদের মোবাইলে চার্জ নেই। টাওয়ার নেই, তাহলে ওর মোবাইল থেকে রিকুংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। আগে উৎপল আসুক!

আমি ঘরে এলাম, স্যাকে কেক ছিল, বের করে সাজিয়ে নিয়ে বসলাম। আসার সময় ভাগ্যিস বুদ্ধি করে বেশ কয়েক বোতল জল তুলে নিয়ে এসেছিলাম। কাল রাতেও চলেছে, এখন দু-বোতল বের করে রাখলাম। উৎপল ঠিক ছেলেটাকে খুঁজে চা কফি করিয়ে নিয়ে আসবে। ওর এনার্জি আছে বটে! স্কুলের ছুটিছাটা

থাকলে আমি ওর সঙ্গে চলে আসি। ওর এক ধরনের খ্যাপামি আছে। তবে এবার মনে হয় একটু বেশিই বাড়াবাড়ি করে ফেলছে। নির্জনতা ভালো, কিন্তু এমন মনুষ্যহীন নির্জনতা বড্ড পীড়াদায়ক। তারপর এসে থেকেই কয়েকটা উল্টোপাল্টা দেখা না-দেখা আমাদের একটু হলেও টলিয়ে দিয়েছে। অথচ সব দেখেশুনেও উৎপল এমন একটা ভাব করছে, যেন সব ঠিক আছে। কিচ্ছু হয়নি।

ঠিকই, কিচ্ছু হয়নি। কিন্তু কিচ্ছু হওয়ার জন্য তো আমরা আসিনি। আমরা এসেছি সেরেফ কয়েকদিন বেড়াতে। নির্জনতা উপভোগ করতে। দেখি, কেয়ারটেকার এলে তার সঙ্গে কথা বলে উৎপলকে বোঝাতে হবে। কোনওভাবে লেপচা ড্রাইভার রিকুংকে খবর পাঠিয়ে দুপুর দুপুর বেরিয়ে, অন্য কোথাও, অন্য কোনও কটেজে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে মানুষজন আছে।

কাল রাতটা খুব অসহ্য লেগেছিল। বার বার মনে হচ্ছিল, এখানে থাকা ঠিক হল না। এত অস্বস্তি নিয়ে কোথাও থাকা যায় না, বিশেষ করে রাত কাটানো। আজ সকালে উৎপল যখন ভাঙা ব্রিজটা দেখাচ্ছিল, আমার হঠাৎ মনে হল, পাগলা ঝোরাটা কটেজের সঙ্গে যোগাযোগের ব্রিজটা যদি ভাসিয়ে দিতে পারে, এই কটেজটাকে কি পারবে না?

দুর দুর! কী আবোলতাবোল ভাবছি! যদি ভাসিয়েই দিতে পারত তাহলে এতদিন কটেজটা থাকত নাকি? আমার এসব কথা শুনলে উৎপল নির্ঘাত হাসবে। আসলে, অস্বস্তি ভরা অলস মস্তিষ্ক—নাহ, বারান্দায় যাই, প্রকৃতি উপভোগ করি।

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েও আমি স্বস্তি পেলাম না। কেন জানি না, প্রকৃতি দেখার বদলে আমি তীক্ষ্ন চোখে পাহাড়ের গায়ে মানুষের বাড়িঘর খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। চারদিকে পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘন জঙ্গলের দেয়াল। এভাবেই বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি।

ছেলেটা বলল, সে কুকুর খুঁজতে এসেছে। কোথা থেকে এল? ব্রিজ তো ভাঙা। নাকি ছেলেটা কাল রাতে এখানেই কোথাও ছিল? কে জানে? ছেলেটা এলেই সব জানা যাবে।

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে তার ঠিক পিছনের ঘরটাই খুলতে ছেলেটা আপত্তি করেছিল। ওই ঘরটা থেকেই একটু আগে গোঙানির শব্দ এসেছিল, বুট পরা পায়ের শব্দ, কিছু একটা জিনিস কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। কই এখন তো কোনও শব্দই নেই।

মনে হয়, পাগলা ঝোরার মতো এখানকার হাওয়াও পাগলা, তারই সব কারিকুরি। হাওয়ার খেলায় গোঙানি ওঠে, কোনও জিনিসে অবিরাম ঠোকর দিয়ে বুট পরে চলাফেরার আওয়াজ হয়, হাওয়ার ধাক্কায় কোনও জিনিস সরে সরে ঘষার আওয়াজ জাগে।

এখন হাওয়া একটু পড়তি, তাই শব্দের বাহুল্যও কম।

আমি বন্ধ দরজার ঘরটার দিকে তাকালাম। কেমন নিরীহ একটা দরজা! একটু আগে ওই ঘরের ভেতরকার কত কিছু আমরা মনে মনে আবিষ্কার করে ফেলেছিলাম।

আমার ভাবনার মধ্যেই হইহই করতে করতে উৎপল এল। যেন বিশ্বজয় করে এসেছে।

এই দেখ গরমাগরম কফি!

কোথায় পেলি? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি।

আরে কিচেনে গিয়ে দেখি, সব আছে। এক্কেবারে ভালোবাসার রাজপ্রসাদ— রাজাই শুধু নেই। দুপুরে নুডুলস বানিয়ে লাঞ্চও করে নেওয়া যাবে।

কাল রাতে আমরা পাউরুটি আর মিষ্টি খেয়েছি। সকালে এই কেক বিস্কুট কফি দিয়ে চালিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু উৎপল কি দুপুরের কথাও ভাবছে?

আমি বললাম, ছেলেটা কি কফি করে দিল?

না, না, সে ব্যাটাকে পাইনি। আমি তো ওই ঝোরার দিকেই দৌড়ে গেলাম, দেখতে পেলাম না। ব্যাটা উবে গেছে। ভোজবাজি! বুঝলি, নির্ঘাত ব্রিজ ছাড়াও ওপারে যাওয়ার অন্য কোনও রাস্তা আছে।

রাস্তা না থাকলে ও আসবে কী করে?

বাঙালি ছেলে—আরে, বাঙালি লোকজন দেখেছিস, একটু কথা বল! তা না, কুকুর কুকুর করে পাগল। কোনও কথাই বলল না। ছেলেটা বেশ ত্যাদড়া! ওই ঘরটা খুলতে আমরা যদি না যেতাম তাহলে হয়তো দেখাও দিত না।

আমি বললাম, হ্যাঁ। কেমন যেন দার্শনিকসুলভভাবে ঘরটা খুলতে বারণ করল, দেখলি।

দেখ গে, ছেলেটা হয়তো রাতে ওই ঘরটায় থাকে। তবে আমার এখন মনে হচ্ছে, কাল এসে যখন আমি আর তুই 'কই হ্যায় কই হ্যায়' করে চিৎকার করছিলাম, তখন ও নির্ঘাত শুনেছে। ব্যাটা শুনেও কেমন ঘাপটি মেরে ছিল। এখন সকালবেলা আর পারেনি, তাই দরজা ফুঁড়ে উদয় হয়েছে।

সব কিছু ঝেড়ে আমি বললাম, আসলে কী বলত, বুনো জায়গায় থাকতে থাকতে এরা অনেক সময় বুনো হয়ে যায়। এখন কেয়ারটেকারটা এলে একটু স্বস্তি পাই। কেয়ারটেকার এলে তুই বরং রিকুংকে ফোন লাগা।

উৎপল বলল, তুই কিন্তু একটু বেশি ভাবছিস। জায়গাটা তোর পছন্দ হয়নি না? আমার কিন্তু বেশ লাগছে। বেশ অ্যাডভেঞ্চারাস!

এখানে অ্যাডভেঞ্চারের আছেই বা কী?

অ্যাডভেঞ্চার নেই বলছিস? ঘরের মেঝেয় ধুলোর মধ্যে পায়ের দাগ থেকে শুরু। তারপর কথা বলতে বলতে উৎপল কেকে কামড় দিল। কফিতে লম্বা চুমুক দিয়ে উৎপল আমার পিছনদিকে এসে একটানে জানলাটা খুলে দিল। আর জানলা খুলে দিতেই যেন ঘরের ভেতর লাফিয়ে পড়ল ঝরনাটা।

পানিঝোরা। সাদা সাদা জলের ফেনা, গুঁড়ো গুঁড়ো জলের উচ্ছ্বাস মুহূর্তে আমাদের মাখামাখি করে দিল। আমি উৎপলের দিকে তাকালাম।

উৎপল বলল, জায়গাটা কিন্তু একসেলেন্ট—কী বলিস অতীন!

সত্যিই অসাধারণ জায়গাটা। কিন্তু আমি পাগলকে সাঁকো নাড়িয়ে আনন্দ দিতে চাইলাম না। আমার মন বলছে, এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়াই ভালো। জায়গাটায় কিছু গোলমাল আছে। কী গোলমাল, সে আমি বলতে পারব না। আসলে এত অস্বস্তি নিয়ে কি কোথাও নৈসর্গ উপভোগ করা যায়? ওই পায়ের ছাপ, পা দুটো, আর কেনই বা দরজাটা খুলতে নিষেধ করল!

কী রে, তুই যেন কেমন ভেবলে গেছিস। ঘরের ভেতর ঢুকে বসে আছিস? চল চল বাইরে চল। বাইরে প্রকৃতির মাঝে বসে কফি খাই।

ঘরের বাইরে যে আমি যাইনি, তা নয়, কিন্তু যতবারই গেছি কেন জানি না ভাঙা ব্রিজটা আমাকে কেমন ভয় ধরাচ্ছে। কাল রাতে ঝোরার জল বেড়ে এই ছোট ব্রিজটা ভাসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই ব্রিজটাই তো এই কটেজের সঙ্গে স্থলের যোগাযোগ রেখেছিল।

বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু এ থামা মানে সাময়িক বিরতি, যে কোনও সময় হুড়মুড় করে নেমে পড়তে পারে। মোবাইল ফোনে টাওয়ার থাকলে অনেক সাহস পাওয়া যায়। অনেকটা যেন পকেটে টাকা থাকার মতো। এখানে টাকার থেকে মূল্যবান মোবাইল সংযোগ।

মৃদু স্বরে বলি, যাচ্ছি। তুই কিন্তু কেয়ারটেকার এলেই রিকুংকে ফোন করবি। আমাদের মোবাইলে কিন্তু টাওয়ার নেই।

উৎপল ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। মৃদু হাসল, এখনই রিকুংকে ফোন করব কী রে? ও আসা মানেই তো এখান থেকে বিদায়। হো-হো হাসল উৎপল। বেশ কাব্য করে বলল, যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব? একাকী যাব না অসময়ে।

ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমিও হাসলাম। কিন্তু হাসতে গিয়েও হাসতে পারলাম না। আমার গলায় কেক আটকে গেল। বিষম খেয়ে প্রচণ্ডভাবে কাশতে কাশতে উৎপলকে বললাম, এ কী রে! রক্ত! রক্ত কেন ঘরের মেঝেতে? ওই দ্যাখ বারান্দায়!

রক্ত!

উৎপল আমার কথায় আঁতকে উঠল। ঘর থেকে বারান্দা ধরে ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত ঝরতে ঝরতে চলে গেছে। উৎপল এক পা এক পা করে ফোঁটা-ফোঁটা পড়ে থাকা রক্ত ধরে এগিয়ে গেল। এই ঘর, এই বারান্দা, বন্ধ দরজা, কাঠের মেঝের ওপর রক্তের ফোঁটা। উৎপল তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আমাদের কাউকে জোঁক ধরেছিল, বুঝলি! এটা জোঁক-খসা রক্ত।

ততক্ষণে আমি বিষম সামলে নিয়েছি। বললাম, হতে পারে। ঠিক তখনই ঘেউ ঘেউ করে কাঠের বারান্দার ওপর উঠে দাঁড়াল গা-কালো কুটকুটে লোমভরা একটা ভয়াল-দর্শন কুকুর। তার সাদা দাঁতগুলো ঝকঝক করছে। সাক্ষাৎ মৃত্যু!

উৎপল ঠান্ডা গলায় বলল, ভয় পাস না। পোষা কুকুর! হিমালয়ান ম্যাস্টিফ! গলার দিকে লক্ষ্য কর বাউটির মতো লোহার বেড় পরানো! লেপার্ড ভালুক হায়না যাতে ওদের ঘাড় মটকাতে না পারে।

কিন্তু আমি কুকুরের গলার লোহার বেড় দেখছিলাম না। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। ওর দাঁতগুলো কী ভয়ংকর! সাদা দাঁতগুলোয় কি রক্ত মাখানো?

ফিসফিস করে বললাম, ওর মুখে রক্ত! এত রক্ত কেন?

উৎপল বিড়বিড় করল, ও তো ঘরের দিকে আসেনি। তাহলে এই ঘরে রক্ত এল কোথা থেকে?

সত্যিই তো, কুকুরটা এই ঘরে আসেনি। অথচ রক্তের ফোঁটা যেন এই ঘর থেকে ঝরতে ঝরতে বাইরে গেছে।

উৎপল উদভ্রান্ত গলায় বলল, কুকুরটা কিন্তু ঘরে আসেনি অতীন!

আমি কিছু বলতে গেলাম, কিন্তু গলায় জোর পেলাম না। কেউ যেন আমার গলা টিপে ধরেছে। শ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।





রাজা ভট্টাচার্য

পঞ্চম পর্ব

উৎপলের শেষ কথাটা যেন আমার মগজের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল বারবার। ঘরের মধ্যে এত রক্ত এল কোথা থেকে? কুকুরটার দাঁতে রক্ত লেগে আছে কেন? এই আশ্চর্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে—চারিদিকের বন, পাহাড় আর বর্ষার জলে খেপে-ওঠা ঝরনার মধ্যে—এই জায়গাটুকু এমন অভিশাপের মতো, এমন ঘৃণার মতো আলাদা কেন? আর সবচেয়ে বড় কথা—সেই অস্বস্তিটা উৎপলকে স্পর্শ করছে না কেন? আমার ভিতর যে ভয়টা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে—সেটা ও বুঝতে পারছে না কেন?

আমি অনেকক্ষণ আগে থেকেই এই ঘরের মধ্যে রয়েছি। অত বড় একটা কুকুর ঘরের মধ্যে থাকল, বা বাইরে থেকে ঢুকে এল ঘরে, আর তারপর আবার বেরিয়ে গেল অথচ আমি খেয়াল করলাম না তা তো হতে পারে না! তাহলে বলতেই হয় কুকুরটা বাইরেই বসেছিল, বারান্দায়! অথবা এই কিছুক্ষণের মধ্যে বারান্দায় উঠে এসেছে বাইরে থেকে। তাহলে অবশ্য আমি ওকে খেয়াল নাও করতে পারি। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ঘরের মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ পড়ে থাকার কোনও যুক্তি থাকতে পারে না।

পাহাড়ি কটেজে কাঠের মেঝেতে এইরকম রক্তের দাগ আমি এর আগেও দেখেছি। ইউনিভার্সিটি থেকে সেবার আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম একটা পাহাড়ি গ্রামে। গ্রামটার নাম রিকিসুম। লাভা থেকে আলগড়া যাওয়ার পথে রাস্তার বাঁকের উপর দাঁড়িয়ে-থাকা ছোট্ট পাহাড়ি গ্রামটা আমাদের মুগ্ধ করে দিয়েছিল। ওইরকম আশ্চর্য বিষণ্ণ নির্জনতা কদাচিৎ দেখেছি জীবনে।

আমরা যে হোম-স্টে'-টায় ছিলাম, সেটা গাড়ি চলার রাস্তার উপরে। তার ঠিক ওপারেই খাড়া পাহাড় উঠে গেছে। পাইনের সবুজ বনে ঢাকা সেই পাহাড়।

তখন জুন মাসের শুরু। পাহাড়ে বৃষ্টি এসে গেছে ততদিনে। চার বন্ধু মিলে আমরা পাইনের বনের সেই সবুজ অন্ধকার শ্যাওলা-ঢাকা পাথুরে রাস্তা বেয়ে উঠে গিয়েছিলাম পাহাড়ের মাথায়। গ্রামের লোকেরা বলেছিল, সেখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার একটা অসাধারণ ভিউ দেখা যায়। আমরা অবশ্য ওরকম কোনও দৃশ্য দেখতে পাইনি। দশ দিগন্ত ঢেকে ছিল মেঘ আর মেঘে—ঠিক যেমন আজ রয়েছে। তবুও পাহাড়-চুড়োয় মেঘ লেগে থাকার আশ্চর্য দৃশ্য আমাদের সম্মোহিত করে ফেলেছিল। সেই প্রথম আমি খেয়াল করেছিলাম, কাছের পাহাড়গুলোকে সবুজ, আর দূরেরগুলোকে নীল দেখায়। কেন—তা তখনও বুঝতে পারিনি, এখনও পারি না।

বেশ খানিকক্ষণ সেই জায়গাটায় কাটিয়ে আমরা আবার নেমে এসেছিলাম ভিজে ভিজে রাস্তাটা ধরে, পা টিপে টিপে, সাবধানে। পাহাড়ে চড়ার মতো ভালো জুতো তখন আমাদের কারোরই ছিল না। সাধারণ চটি কিংবা কেডসজাতীয় জুতো পরা ছিল পায়ে। ফলে তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল খুব। অত উপর থেকে পড়লে আর রক্ষে নেই। ভয়ে ভয়ে, পাইনগাছের স্যাঁতস্যাঁতে গুঁড়িতে হাতের ভর রেখে সাবধানে নামছিলাম আমরা।

তখন কিছু টের পাইনি। পাইনের ডাল থেকে টপটপ করে ঝরে পড়ছিল জলের ফোঁটা। কিন্তু হোম-স্টেতে ফিরে যখন ঘরে ঢুকব, তখনই হঠাৎ পিছন থেকে এক বন্ধু চিৎকার করে উঠেছিল, এই অতীন! মেঝের উপরে ওটা কীসের দাগ রে?

চমকে পিছন ফিরে আমি দেখেছিলাম, আমার ঠিক পিছন পিছন বাদামি কাঠের মেঝের উপর আমাকে অনুসরণ করে চলেছে একজোড়া রক্তাক্ত পদচিহ্ন।

অমন ভয় আমি এর আগে কখনও পাইনি। আমার পায়ে অন্তত দশখানা জোঁক তখনও কিলবিল করছিল। রক্ত পড়ছিল ঝরঝর করে, অথচ কোনও ব্যথা ছিল না। আমরা চিৎকার চেঁচামেচি করায় ভেতর থেকে ছুটে

এসেছিল পাহাড়ি পরিবারটি—যারা হোম-স্টে চালায়। তারা কিন্তু মোটেই বিচলিত হয়নি। একটা লাঠি, তার মাথায় একটা নুনের পুঁটুলি বাঁধা—তাই দিয়ে দিব্যি ছাড়িয়ে দিয়েছিল জোঁকগুলোকে। এমনকী আমাদের ঘাড়ে মাথায় পর্যন্ত লেগেছিল জোঁক। পাহাড়ি ছেলেগুলো বলছিল, ওগুলো গাছের পাতা থেকে ঝরে পড়েছে। বহুক্ষণ লেগে ছিল সেই রক্তপাত বন্ধ হতে।

এক মুহূর্তে এই রক্তের দাগ আমাকে সেই ভয়ার্ত স্মৃতি মনে করিয়ে দিল। চট করে নিজের পায়ের দিকে তাকালাম। আমার পায়ে এই মুহূর্তে একজোড়া স্নিকার। তার ভিতরে যদি জোঁক থেকেও থাকে, তা হলেও অমন ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়ে থাকার কোনও যুক্তি নেই।

এর একটাই যুক্তি হতে পারে। এই রক্ত ঝরে পড়েছে কুকুরটার মুখ থেকে। কুকুরটা মুখে করে এমন একটা কিছু নিয়ে বাইরে থেকে এই ঘরে ঢুকেছে, যার থেকে রক্ত পড়ছিল। ঘটনাটা ঘটেছে খুব বেশি হলে দশ মিনিটের মধ্যে ; অথচ আমি দেখতে পাইনি।

অসম্ভব! অসম্ভব!!

কিন্তু এই মুহূর্তে কুকুরটাকে আমরা দুজনেই দেখতে পাচ্ছি। সিঁড়ির পাশে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে কুকুরটা, নিশ্চিতভাবে আমাদের দেখেই। উৎপলের সারমেয়-প্রীতি অতুলনীয় ; রাস্তার নেড়িকুকুর দেখলেও ও একবার মাথায়-ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দেয়। কিন্তু এই কুকুরটা প্রকাণ্ড। বড় বড় কালো লোম ওর সারা শরীর ঢেকে রেখেছে ; শুধু মুখটা হালকা বাদামি রঙের। এখন সেই মুখটা হাঁ হয়ে রয়েছে, আর দাঁতগুলো থেকে টপটপ করে ঝরে পড়ছে রক্ত—যেন এইমাত্র কাউকে ভয়ঙ্করভাবে কামড়ে দিয়েছে কুকুরটা।

আর তার চেয়েও আশ্চর্য হলাম উৎপলের কাণ্ড দেখে। এই বীভৎস দৃশ্যটা, কিংবা একটু আগে মেঝেতে পড়ে-থাকা রক্তের দাগ দেখে ওর মধ্যে যে বিস্ময়টা ছিল—সেটাও যেন মুহূর্তে ভুলে গিয়ে ও নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গেল বারান্দার দিকে। ওকে দেখে কুকুরটাও এগিয়ে এসে সিঁড়ির মুখটা আগলে দাঁড়াল পাহারাদারের মতো।

পাহাড়ি কুকুরের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে আমার কোনও জ্ঞান নেই। যতবারই পাহাড়ে বেড়াতে এসেছি, বড় বড় লোমে-ঢাকা ছোট-বড় সাদা-কালো—নানা ধরনের কুকুর দেখেছি। পাহাড়ি লোকেরা এদের যত্ন করে পোষে। ভালোবাসে খুব।

পানিঝোরা কটেজটা অবশ্য সে-অর্থে কোনও পাহাড়ি গ্রাম নয়। এই মুহূর্তে ঝরনার জলস্ফীতি জায়গাটাকে মূল সড়ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, তা ঠিকই। কিন্তু সেটা না হলেও বলতে হত, কটেজটার অবস্থানটাই কেমন একটু বিচ্ছিন্ন। পিছনের পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসছে ঝরনাটা। তারপর ছোট একটা নদীর রূপ ধরে বয়ে গিয়েছে রাস্তার সমান্তরালে। এই নদীটার উপরে কাঠের ছোট্ট একটা সাঁকো, যেটা পৌঁছেছে পাহাড়ের একটা খাঁজের পায়ের কাছে।

কটেজটা এই খাঁজের ফাঁকে দাঁড়িয়ে আছে। এর পেছন থেকে ঢালু হয়ে উঠে গেছে পাহাড়। সেখানে ঘন জঙ্গল। আশেপাশে কোথাও জনবসতি আছে বলেও মনে হয় না, অন্তত তেমন কোনও আওয়াজ আমরা কাল থেকে পাইনি। তাহলে এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় এমন একটা প্রকাণ্ড পোষা কুকুরের আবির্ভাব ঘটল কোত্থেকে?

উৎপল অবশ্য কুকুর দেখলে এত কিছু ভাবে না। ও সোজা গিয়ে বসল কুকুরটার সামনে হাঁটু গেড়ে। ঘরের ভিতর থেকে ভারী অদ্ভুত দেখাচ্ছে দৃশ্যটা। পিছনের সবুজ পাহাড়ের পশ্চাৎপটে ফুটে আছে একটা নাটকীয় দৃশ্য। কটেজের কাঠের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে একটা মানুষ। তার মুখে ফুটে আছে আদরের রেখা। তার সামনে বসে আছে একটা প্রকাণ্ড কালো কুকুর। তার মুখটা বাদামি। সেই মুখে এখনো লেগে আছে রক্তের দাগ। অথচ সামনে বসে থাকা মানুষটা যেন তা দেখতে পাচ্ছে না, অথবা যেন কুকুরের মুখ থেকে অমন রক্ত ঝরে পড়ারই কথা। সেটাই স্বাভাবিক।

এইবার উৎপল হাত বাড়িয়ে দিল কুকুরটার মাথার দিকে, যেন ওকে আদর করে দেবে। কুকুরটা কিন্তু এগিয়ে আসা হাতটাকে গ্রাহ্য করল না। তার বদলে ও চার পায়ের উপর ভর রেখে উঠে দাঁড়াল। এখন হাঁটু গেড়ে বসে থাকা উৎপলের প্রায় মাথায় মাথায় কুকুরটা। সত্যিই বিশাল চেহারা। কুকুরটা ওর দিকে এগোচ্ছে না দেখে উৎপল নিজেই উঠে পড়ল। মুখে আদরের চুকচুক শব্দ করতে করতে এগিয়ে গেল কুকুরটার দিকে। আর ঠিক তারপর আমার সর্বাঙ্গ হিম করে দিয়ে, মুখে চুকচুক শব্দ করে ওর দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাওয়া উৎপলকে ভেদ করে, কুকুরটা এগিয়ে এল ঘরের দিকে! আমার দিকে! বাইরে এখন হু-হু হাওয়া। আমি তার স্পষ্ট শব্দ পাচ্ছি। অথচ ঘরের পর্দাটা অনড়। সেটাকেও ভেদ করে ঘরের ভেতরে ঢুকল কুকুরটা। এবার সে এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

আমি বুঝতে পারলাম, আমার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে। কুকুরটা উৎপলকে ভেদ করে, তারপর পর্দাটাকে ভেদ করে ঘরে ঢুকে পড়েছে; অথচ আমি এখনও উৎপলকে দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি, ও বারান্দার উপর বসে আছে হাঁটু গেড়ে, প্রাচীন মূর্তির সামনে নতজানু মানুষের মতো। কুকুরটার এই আশ্চর্য এগিয়ে আসাটা, কিম্বা ওকে ভেদ করে চলে যাওয়াটা যেন ওকে স্পর্শমাত্র করতে পারেনি। এখনো ওর মুখে স্নেহার্দ্র হাসি স্পষ্ট, হাত দুটো উঠে রয়েছে আদরের মুদ্রায়—যেন সেই দুটি হাতের মধ্যে এই মুহূর্তে রয়েছে কোনও অদৃশ্য কুকুরের প্রকাণ্ড বাদামি মাথা, আর ও আদরের হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সেই রোমশ মাথায়।

আমি যেন একই দৃশ্যের দুটো অংশকে, একই সময়ে দুই জায়গায় অভিনীত হতে দেখছি। দরজার বাইরে খোলা বারান্দায় হাঁটু গেড়ে বসে আছে উৎপল। ওর দেহভঙ্গি দেখলে মনে হচ্ছে, যেন কোনও প্রকাণ্ড কুকুরকে ও খুব আদর করছে, কুকুরটা ওর বুকে ঘাড়ে মাথায় আদর করে মুখ ঘষে দিচ্ছে। ওর চোখমুখ উদ্ভাসিত, প্রিয়জনের সঙ্গে কিছুক্ষণের বিচ্ছেদের পর আবার মিলন ঘটলে মানুষের মুখ যেমন হয়—ঠিক তেমনি।

আর ঘরের ভিতরে আমার দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে একটা কুকুর। একটা প্রকাণ্ড রোমশ শিকারি কুকুর! কিন্তু তার চোখ আমার দিকে নয়। তার এগিয়ে আসার ভঙ্গিতেও লেগে আছে প্রভুভক্তি আর ভালোবাসা, যেন সে এমন কারোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—যে তাকে খুব আদর করবে এক্ষুনি, ভালোবেসে হাত বুলিয়ে দেবে ঘাড়ে মাথায়।

কে সে? ঘরে তো আর কেউ নেই! কুকুরটা কার দিকে এগোচ্ছে? উৎপল কাকে আদর করছে? এ কোন অজানা জাদুতে আমি একটা দৃশ্যকে দু-টুকরো করে ভেঙে ফেলেছি?

ঠিক সেই সময় আমার পিছন থেকে ভেসে এল একটা তীক্ষ্ন খিলখিল হাসির শব্দ। তারপর আদুরে গলায় কেউ বলে উঠল পরিষ্কার বাংলা ভাষায়, তুই আবার খরগোশ মেরেছিস? তোকে আর ভদ্রলোক বানাতে পারলাম না।

প্রচণ্ড আতঙ্কে এক ঝটকায় পেছনের দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। সেই ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মধ্যে—যাকে একটু আগেই গোটা জায়গাটা তন্নতন্ন করেও আমরা খুঁজে পাইনি। ছেলেটার পরনে একটা শতচ্ছিন্ন নোংরা ডোরাকাটা উর্দি-ধরনের জামা; স্পষ্টতই সেটা অনেকদিন কাচা হয়নি। আমি পড়ে গেছি ছেলেটার আর কুকুরটার ঠিক মাঝখানে! পায়ে পায়ে আমার দিকে এগিয়ে এল কুকুরটা।

এবার বুঝতে পারলাম, আমার পা দুটো আমার কথা শুনছে না। এরকম অনুভূতি এর আগে কখনও আমার হয়নি; হতে পারে—তাও ভাবিনি কখনও। কিন্তু এই মুহূর্তে এটাই বাস্তব—আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি এই ছেলেটা আর কুকুরটার মাঝখান থেকে সরে দাঁড়াতে; কিন্তু আমার পা দুটো আমাকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না কোনওক্রমেই।

তার চেয়েও বড় সমস্যা হল—চোখটা আবার বিশ্বাসঘাতকতা করছে! ছেলেটা আমার থেকে বড়োজোর পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ বারবার কেমন যেন ঝাপসা দেখছি ওকে। একটু আগে বাইরে ঝলমলে রোদ্দুরে যেমন, তেমনই এখন ঘরের মধ্যেও—ছেলেটা বার বার ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে; যেন ওর মধ্যে একটা

অলীক স্পন্দন আছে। কয়েক সেকেন্ড পরে পরেই আমি আবছা দেখতে পাচ্ছি ছেলেটার পেছনের খোলা জানলা, সেই জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাইরের উন্মত্ত জলপ্রবাহ, ওপাশের খাড়া উঠে যাওয়া সবুজ পাহাড়টা।

পরক্ষণেই একটা অদ্ভুত শিরশিরে অনুভূতি তুলে আমাকে স্থানু করে রেখে, আমায় পেরিয়ে গেল কুকুরটা। ভেদ করেই! ওর মুখ থেকে এখন আদুরে গুড়গুড় শব্দ বেরোচ্ছে। ছেলেটা এবার হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মাটিতে, ঠিক যেভাবে বারান্দায় বসে আছে উৎপল...মানে...বসে আছে কি এখনও? জানি না কারণ ঘাড় ফিরিয়ে সেই দৃশ্য পরখ করে নেওয়ার মতো শারীরিক বা মানসিক শক্তি এই মুহূর্তে আমার শরীরে একটুও অবশিষ্ট নেই। এখন ওরা দুজন মানে কুকুরটা আর ছেলেটা প্রায় মাথায় মাথায়। ছেলেটা দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে কুকুরটাকে, হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ওর মাথায়-ঘাড়ে-পিঠে; যেন খুব কাছের দুই বন্ধুর দেখা হয়েছে। কুকুরটা ওর মাথায় বুকে ঘষে দিচ্ছে ওর প্রকাণ্ড মাথাটা, ওর গলা থেকে উঠে আসছে আদর পাওয়ার অর্ধব্যক্ত আনন্দময় শব্দ।

বেশ খানিক আদরের পর আবার চার পায়ে দাঁড়াল কুকুরটা। ছেলেটাও উঠে দাঁড়াল সোজা হয়ে। তারপর ছেলেটা আর কুকুরটা পাশাপাশি হেঁটে গেল সোজা কাঠের দেওয়ালের দিকে; আর সেটাকে ভেদ করে বেরিয়ে গেল বাইরে! আর দেখা গেল না ওদের।

কয়েক পলকের জন্য আমার মনে হল—আমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছি। গত কয়েক মিনিটে এই ভূমিখণ্ডটাতে, এই কটেজে, এই বারান্দায় এবং এই ঘরে—যে দৃশ্য অভিনীত হয়ে গেল, তার কোনও বাস্তব ভিত্তি থাকতে পারে না। মুশকিল হল, আমি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে এতক্ষণ ধরে এগুলো দেখে চলেছি, এবং কী আশ্চর্য—এখনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাইনি।

এতক্ষণে নড়ার ক্ষমতা ফিরে পেয়ে পেছন ফিরে তাকালাম আমি। মেঝেতে এখন আর কোনও রক্তের দাগ নেই, যেন কখনও ছিল না।

সিঁড়ির ঠিক সামনে, ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে উৎপল। যতক্ষণ আমি ঘরের ভিতরের দিকে মুখ করে কুকুরটা আর ছেলেটার কাণ্ডকারখানা দেখছিলাম, তার মধ্যেই কখন উৎপল উঠে দাঁড়িয়েছে, আমি খেয়াল করিনি। এখন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ওর মুখে একটা অদ্ভুত বিহ্বল হাসি, চোখ দুটো আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে—কিন্তু আমাকে দেখছে না। সেই দৃষ্টি সম্পূর্ণ অন্য কোনও জগতে নিবদ্ধ যেন এই মুহূর্তে ও এখানে নেই। বা আরও ঠিক করে বলতে গেলে—ও এখানেই আছে, কিন্তু এই মুহূর্তটাতে নেই।

আমার বারবার মনে হতে লাগল, আমি সময়ের রেখায় এলোমেলো পা ফেলে হেঁটে চলেছি; অতীত আর বর্তমান ক্রমাগত নিজেদের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করে চলেছে, আর কোনও অজ্ঞাত উপায়ে আমি একইসঙ্গে দুটি সময়ের সাক্ষী হয়ে পড়ছি। অথচ সেই পরিবর্তনের নিহিত তাৎপর্য আমার মাথায় ঢুকছে না! একটা জমাট ভয়, একটা অন্ধকার আতংক আমার স্বাভাবিক যুক্তিবোধকে ধ্বংস করে ফেলছে।

অথচ এটা দিনের বেলা। বড় রাস্তা থেকে বড়জোর তিন মিনিটের দূরত্বে রয়েছি আমরা। সভ্য জগতের, গাড়ি-চলা রাস্তার এইটুকু দূরে দাঁড়িয়ে আমি এভাবে নির্বাসিত হতে পারি না। উৎপল স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। আমিও হয়তো পুরোপুরি নেই, কিন্তু ওর চাইতে ভালো অবস্থায় আছি। আর তাই এই গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসার দায়িত্ব আমার। উৎপলকে বের করে আনাও আমারই দায়িত্ব। ও আমার বন্ধু।

এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে উৎপলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। ওর দুই কাঁধে হাত রেখে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে যেন নিজের ভিতরে এতক্ষণ থমকে-থাকা প্রচণ্ড ভয়টাকে বের করে দেওয়ার একটা অক্ষম

চেষ্টা করলাম। নড়ে উঠল উৎপলের জমাট হয়ে যাওয়া শরীরটা। তারপর ফাঁকা ঘরের থেকে চোখটা আমার দিকে সরিয়ে ও ফিসফিস করে বলল, আমি এই ছেলেটাকে আগে দেখেছি রে অতীন! আমি ওকে চিনি। ছোটবেলা থেকে চিনি। কিছুতেই মনে পড়ছে না—কোথায় যে দেখেছি!

আমি হাঁ হয়ে গেলাম। একটা কুকুর আমার গা ফুঁড়ে চলে গেল, একটা ছেলে দেওয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল—এ সবের কিছুই কি উৎপল দেখেনি? নাকি ও সত্যিই পাগল হয়ে যাচ্ছে? নাকি আমিই...

উৎপলকে কিছু বলতে যাওয়ার আগেই উৎপল কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, মনে পড়েছে! মনে পড়েছে রে! আমাদের বাড়ির পুরোনো অ্যালবামে এই ছেলেটার একটা সাদা-কালো ছবি আছে।



চুমকি চট্টোপাধ্যায়

ষষ্ঠ পর্ব

তোদের ফ্যামিলি অ্যালবামে যখন এই ছেলেটার ছবি দেখেছিস বলছিস, তার মানে তোদের আত্মীয়ই কেউ হবে! মনে করার চেষ্টা কর তাহলে।

আরে না রে। তখনকার সময়ে কেবল আত্মীয়স্বজনই নয়, যারই ছবি হাতের কাছে পেত, অ্যালবামে সেঁটে দিত। আসলে তখনকার দিনে ছবি তোলা বেশ একটা কঠিন কাজ ছিল। বড়দের মুখে শুনেছি, ছবি তুলতে ফটোগ্রাফার আসবে শুনলে একটা সাজো-সাজো রব পড়ে যেত বাড়িতে।

আমাদের বাড়িতেই বাবার কোনও এক সম্পর্কিত দাদা ম্যালেরিয়ায় ভুগে রোগাভোগা হয়ে গেছিলেন। কিন্তু যেহেতু সেদিন বায়না দিয়ে বাড়িতে ফটোগ্রাফার আনা হয়েছে, অতএব সেই চেহারাতেই তার ছবি তোলা হয়েছে। সে ছবি আবার বাঁধানোও আছে। আমিও দেখেছি...আবার এমনও হয়েছে, বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান, যেমন ধর বিয়ে, সেখানে ফটো তোলার কাউকে পাওয়া গেল না বলে ছবিই উঠল না।

আমার বড় দিদা, মানে মায়ের বড় মাসির বিয়ের কোনও ছবি ছিল না বলে খুব আক্ষেপ করতেন বলে শুনেছি। এখন তো ফটো তোলা আর জল খাওয়া সমান সহজ। তাই ওই ছেলেটা যে আমাদের আত্মীয় কেউ তা নাও...

কী রে, থেমে গেলি কেন? অ্যাই উৎপল!

আমার মনে হল উৎপল যেন এই জগতে নেই, অন্য কোথাও হারিয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টি খোলা জানলা পেরিয়ে দুরন্ত ঝরনার জল ভেদ করে অসীমে গিয়ে কিছু খুঁজছে। মাঝে মাঝে উৎপলকে দেখেও ভয় লাগছে আমার। এখন যেমন—গা-টা শিরশিরিয়ে উঠল। বেশ জোর গলাতেই ডাকলাম ওকে।

উ-ৎ-প-ল...!

মুহূর্তে চোখের দৃষ্টি পালটে গেল ওর। সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, মনে পড়েছে।

কী? কী মনে পড়েছে? ওই ছেলেটা...

এ তো আমার দাদুর জোয়ান বয়েসের চেহারা রে!

থতমত খেয়ে গিয়ে বলি, কী আবোলতাবোল বকছিস বল তো উৎপল! এতদিন পর তোর দাদু এখানে আসবেন কোত্থেকে? তাও আবার সেই জোয়ান বয়েসের চেহারায়? তোর মাথাটা পুরো গেছে। ছবিটা ভালো করে মনে নেই, তাই মিল খুঁজে পাচ্ছিস।

দাদু বলতেন, ওনাকে নাকি ওনার মেজকাকার মতো দেখতে।

তার মানে তুই বলতে চাইছিস—ইনিই গঙ্গাচরণ চক্রবর্তী?

ইয়েস! মৃত্যুর পর তো আর বয়েস বাড়ে না রে অতীন, জানিস না? হয়তো এখানেই গঙ্গাদাদু কোনওভাবে লুকিয়ে থেকে পরবর্তীকালে মারা যান। আমি—আমি হানড্রেড পারসেন্ট শিওর, ওই ছেলেটা গঙ্গাদাদুই।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। এমনিতেই এই জায়গাটা রহস্যময়। নানারকম উল্টোপাল্টা ঘটনা ঘটছে। তাছাড়া, কী এসে যায় ছেলেটি কে তা জেনে? পরিচয় না জানলেই বা কী? এটুকু তো বোঝা গেছে ছেলেটা আর তার কুকুরটা বেশ অস্বাভাবিক। শরীর ফুঁড়ে বেরিয়ে যাওয়াটা মনে পড়তেই কাঁপুনি দিল।

বাইরে তাকিয়ে মনে হল বেশ বেলা হয়েছে। একটু যেন খিদে খিদে পেয়েছে। উৎপলকে জিগ্যেস করলাম, দুপুরে কী খাবি? পিনাট বাটার দিয়ে সেই শুকনো পাঁউরুটি? শুকনো খাবার তো ফুরিয়ে আসছে রে। কতদিনে এখান থেকে বেরোতে পারব কে জানে। খাবার যা আছে তাতে কদ্দিন চলবে আর?

আরে ধুর পাগল! চিন্তা করছিস কেন! রেঁধে খাব রে। কিচেনে চল, মালমশলা অনেক আছে, গরমাগরম কিছু বানিয়ে নেওয়া যাবে। কাল দেখেছিলাম নুডলস আছে। মানচাও নুডলস বানিয়ে ফেলি গে। সয়া সস থাকলেই হয়ে যাবে। আমি যাচ্ছি, তুই আয়। ও হ্যাঁ, একবার দেখিস তো মোবাইলে টাওয়ার ধরেছে কিনা। এই এক উৎপাত এখানে, টাওয়ারই থাকছে না।

আমি মনে মনে ভাবলাম, কেবল একটাই উৎপাত?

উৎপল লম্বা লম্বা পা ফেলে বাড়ির পেছনে কিচেনের দিকে গেল। এই পরিস্থিতিতেও ওর মানচাও নুডলস বানাবার শখ দেখে হাসি পেল আমার। প্রকৃতই খাদ্যরসিক ছেলে! আমি ঘরে ঢুকলাম মোবাইল দেখতে।

ঘরে পা রাখতেই জানলার দিকে চোখ গেল। পর্দাটা হাওয়ায় উড়ছে। বাইরের বারান্দায় সেই পা জোড়া না? চমকে উঠলাম। ঝকঝকে দিনের আলোতেও কী সব দেখছি আমি! নিজের মাথায় একটা চাঁটি মারলাম। একটু বেশিই ভয় পাচ্ছি।

চোখ বন্ধ করে আবার খুললাম। বারান্দার কাঠের রেলিঙে দুটো শালিক বসে আছে। ওহ, তাই বলো! দিনের বেলাতেই উল্টোপাল্টা দেখতে শুরু করেছি। নিজেকে একটু বোকা মনে হল। এত ভয় পেলে চলবে না, ঠিক এই কথাটাই কানের কাছে কেউ যেন ফিসফিস করে বলল। কে রে? নিমেষে পেছন ঘুরলাম। কই, কেউ নেই তো! মনের কথার প্রতিধ্বনি হয়? হতেও পারে। কত কী-ই তো জানি না।

আমার মোবাইলটা হাতে নিয়ে টাওয়ার আছে কিনা দেখতে গিয়ে বুঝলাম, চার্জের অভাবে ফোনটা বন্ধ হয়ে গেছে। সুইচবোর্ডে প্লাগপয়েন্ট আছে কিনা দেখতে গিয়ে আবারও চোখ গেল বারান্দায়। সেই পাখিদুটো নেই। ভৌক শব্দটা কানে এল। সেরেছে, কুকুরটা আবার এল নাকি রে! নাহ, এসব ভেবে লাভ নেই। উৎপল বেশ কিছুক্ষণ হল কিচেনে গেছে। আমারও যাওয়া উচিত। রাঁধতে না পারি, আনুষঙ্গিক কাজে সাহায্য তো করতে পারব।

আমার মোবাইলটা খাটের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে তড়িঘড়ি উৎপলের মোবাইলটার খোঁজ করি। দেখতে না পেয়ে কিচেনে যাব বলে বারান্দায় বেরোলাম।

সিঁড়ির দিকে যেতে গিয়ে আবার সেই ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত চোখে পড়ল! পাখিদুটো যেখানে বসেছিল, ঠিক তার নীচে কাঠের মেঝেতে। আমি চোখ বন্ধ করে কোনওরকমে সিঁড়ি দিয়ে নেমে কিচেনের দিকে দৌড় লাগালাম।

বাড়িটা থেকে আউটহাউস আর কিচেনের দূরত্ব খুব বেশি হলে তিনশো মিটার। আজকাল দৌড়তে বিশেষ পারি না। হাঁফ ধরে যায়। খানিক দৌড়ে তারপর হাঁটতে শুরু করলাম।

বাড়ির কথা মনে পড়ল। মা, স্নিগ্ধা, রুবাই, পাপন...কেমন আছে ওরা? ভার হয়ে গেল মনটা। কবে আবার দেখা হবে ওদের সঙ্গে? খুব চিন্তা করছে নিশ্চয়ই। যদিও বলে এসেছি, যেখানে যাচ্ছি সেখানে মোবাইলের টাওয়ার নাও থাকতে পারে। সঙ্গে উৎপল আছে, চিন্তা না করতে। তাও, বেশ কিছুদিন হয়ে গেল যোগাযোগ নেই। চিন্তা তো ওরা করবেই। কী করে ফিরব, কবে ফিরতে পারব আদৌ, বুঝতে পারছি না।

কিচেনের বাঁদিকেই আউটহাউস। ঝোপেঝাড়ে ভর্তি। বোঝাই যাচ্ছে, বহুকাল মানুষের পা পড়ে না ওখানে। ডাইনিবুড়ির গল্পে যেমন বাড়ির ছবি থাকে, তেমন লাগছে দেখতে। কিচেনে যেতে গেলে আউট হাউসের পাশ দিয়েই যেতে হবে।

আউট হাউসের দরজাটা খোলা। ভেতরে জমাট অন্ধকার। তাও কী এক আকর্ষণে তাকিয়ে থাকলাম সেদিকে। আরে! কী একটা নড়ছে মনে হচ্ছে ভেতরে? বাইরের আলোর এক কণাও ঢোকেনি ঘরটার মধ্যে।

কুকুরটা নাকি? যাব ভেতরে? নিশ্চয়ই ওই ছেলেটা কুকুরটাকে নিয়ে এখানেই লুকিয়ে থাকে আর সুযোগ বুঝে ভয় দেখায়। এতক্ষণে ধরেছি ব্যাপারটা। ঢুকে চেপে ধরি ব্যাটাকে! ইয়ার্কি মারা বেরিয়ে যাবে।

হঠাৎই একটা ধাক্কা লাগল মাথায়। আচ্ছা, জ্যান্ত প্রাণী কি শরীর ভেদ করে যেতে পারে? তাহলে? প্রবল ধস্তাধস্তি শুরু হল আমার ইচ্ছে আর বাস্তব বোধের মধ্যে।

ইচ্ছেকে পরাজিত করে নিজেকে বলতে গেলে টেনে নিয়েই কিচেনের দিকে গেলাম। দু-পা ডানদিকে গেলেই কিচেন। এই দু-পা রাস্তাও মনে হচ্ছে অনন্ত। ওখানে উৎপল আছে ভেবে মানসিক জোর পেলাম। এই তো ঢোকার দরজা। মাথা ঝাঁকিয়ে, গলা খাঁকারি দিয়ে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে হাঁক পাড়লাম।

কীরে, তোর মানচাও হল? লোভ লাগছে মাইরি। সরি, আমার একটু দেরি হয়ে গেল মোবাইল দেখতে গিয়ে। জানি তোর হেল্পের দরকার নেই তাও...

এক-বার্নারের আভেনের ওপর একটা সসপ্যান বসানো। অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে তা থেকে। কিন্তু উৎপল কই? এদিক-ওদিক তাকালাম। মক্কেল গেল কোথায়? ভেতরে কোনও স্টোররুম আছে নাকি? ভালো করে খুঁজেও আর কোনও দরজা বা ফাঁকফোকর চোখে পড়ল না। আমি বেরিয়ে এলাম কিচেন থেকে।

উৎপল, উৎপল...! খোলা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে ডাকতে লাগলাম। হঠাৎ করেই একতাল কালো মেঘ উড়ে এসে ঢেকে দিল সূর্যকে। এরকম আগেও দেখেছি। এই মেঘ, এই রোদ্দুর। ঝকঝকে দুপুরটা কেমন ঝিমঝিমে সন্ধে নামার আগের অবস্থায় চলে গেল।

কী সুন্দর লাগছে এই মায়াবী আলোয় ঝোরাটাকে! মায়াময় এক ঝরনা। ঘোর লেগে যাচ্ছে আমার। যেন অনেক লোক ছোটাছুটি করছে, ঘোড়ার খুরের শব্দ, শপাং শপাং করে চাবুক ঘোরাচ্ছে কেউ, গোঙানির শব্দ, পাশবিক চিৎকার করছে কেউ, আমি দৌড়চ্ছি, লুকোবার জায়গা খুঁজছি, কেউ একজন আমার শার্টের কলার খামচে ধরল...চটকা ভেঙে জেগে উঠলাম আমি।

কী হল ব্যাপারটা! ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নাকি? স্বপ্ন দেখে ফেললাম? ভাবতে ভাবতেই সামনে তাকিয়ে দেখলাম, খাঁকি হাফপ্যান্ট পরা সেই ছেলেটা আর কুকুরটা হেঁটে যাচ্ছে ঝোরার দিকে।

ওদের পেছন পেছন কে যাচ্ছে? উৎপল!



বিনোদ ঘোষাল

সপ্তম পর্ব

উৎপলের হাঁটাটা কেমন যেন...এলোমেলো। হাঁটুদুটো সামান্য মুড়ে টলমল করে হেঁটে যাচ্ছিল উৎপল। নেশা করে মানুষ যেমন হাঁটে অবিকল তেমন।

এখন ঘড়িতে বেলা দশটা বাজে। কিন্তু তা বোঝার উপায় নেই। সকালে দিব্বি রোদ উঠেছিল, কিন্তু পাহাড়ি অঞ্চলের আবহাওয়ার মতিগতি বোঝা ভার। ঝলমলে সকাল দ্রুত বদলে যাচ্ছিল, সূর্য ঢেকে যাচ্ছিল ঘন মেঘে। দেখতে দেখতে অন্ধকার নেমে এল। সন্ধের মতো অন্ধকার।

পাহাড়ি অঞ্চলের এই রোদ-মেঘের খেলা আমি জীবনে প্রথমবার দেখছি না, বেড়ানোর বহু অভিজ্ঞতার কারণে প্রকৃতির এই ছেলেমানুষির অনেক সাক্ষী হয়েছি। কখনও সান্দাকফু তো কখনও কাশ্মীর, কখনও দেরাদুন তো কখনও লাভা-লোলেগাঁও। কিন্তু সেইসব মেঘের মধ্যে একটা আলাদা সৌন্দর্য ছিল, ভয় নয়, আতঙ্ক নয়। কিন্তু এই মেঘটাকে কেমন যেন মনে হচ্ছিল প্রকাণ্ড এক বাদুড় তার কালো দুটো ডানা দিয়ে আকাশটাকে ঢেকে ফেলছে। মনে হচ্ছে বাদুড়টা নেমে আসছে... আরও নিচে নেমে আসছে। হাওয়াটা যেন ওর প্রশ্বাস। একটা অশুভ বোধে আমার গায়ে বারবার কাঁটা দিতে শুরু করল।

এমনিতেই এই কটেজে আসার পর থেকে একের পর এক খারাপ অভিজ্ঞতা হয়ে চলেছে। ভালোলাগার বদলে খারাপ অভিজ্ঞতাই বেশি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছিল সেই খারাপটা যেন চূড়ান্ত খারাপ কোনও পরিস্থিতির দিকে এগোচ্ছে। আমি থমকে দাঁড়িয়ে এইসব ভাবছিলাম। আচমকাই আমার খেয়াল হল উৎপল আরও ঘন জঙ্গলে ঢুকে যাচ্ছে।

জঙ্গলে এলোপাথাড়ি ঘুরে বেড়ানোর নেশা আমার আর উৎপলের বরাবরের। একা একাও অনেক ঘুরেছি, কখনও বিপদের ভয় পাইনি। কিন্তু আজ আমার মনের ভেতর কেউ একজন বলে উঠল, যেও না আর যেও না ওখানে! বিপদ! কী বিপদ? জানা নেই। গা ছমছম করে উঠল আমার। এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেলাম।

কী করব? আমার কি এখনই দৌড়ে গিয়ে উৎপলকে বাধা দেওয়া উচিত, নাকি নিজের প্রাণ বাঁচানো উচিত? ভয় আমাকে এতটাই জড়িয়ে ধরেছে যে মনে হল, দুনিয়ার সকলে চুলোয় যাক, আমি নিজেকে বাঁচাই। কিন্তু পরক্ষণেই আমার বিবেক আমাকে ধিক্কার দিল। কতদিনের পুরনো বন্ধু আমরা...কত স্মৃতি...আজ এই অবস্থায় শুধু নিজেকে সেফ রাখার জন্য বন্ধুকে এই বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে পালাব? যদি উৎপলের সত্যিই কোনও ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে আমি কি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব? আর যদি একান্ত স্বার্থপর হয়ে নিজেকেই বাঁচানোর চেষ্টা করে আমি জঙ্গলে না ঢুকি তাহলে ফিরব কোথায়? এই কটেজে? যেখানে আমার এক মুহূর্তের জন্যও থাকার ইচ্ছে নেই।

এই কটেজ অভিশপ্ত। অনেককিছুই রহস্যময় এই পানিঝোরা কটেজে। তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। ওখানে একা আমি থাকতে পারব না। কটেজ ছেড়ে বাড়ি ফেরার রাস্তাও যে বন্ধ। ফলে আমার আর কোথাও যাওয়ার নেই। এখন অন্ধকার হয়ে এলেও তবু দিন, বিকেলের পর যখন সত্যি অন্ধকার হয়ে যাবে তখন আমার পক্ষে জাস্ট একা থাকা মানে মৃত্যুর সামিল। সুতরাং শেষ চেষ্টা করাই সবদিক থেকে শ্রেয়। আমি আবারও দুই হাত তুলে প্রাণপণে চিৎকার করে ডাকলাম, উৎপল! যাস না...প্লিস! আমার কথা শোন ভাই!

কিন্তু আমার ডাক উৎপলের কান পর্যন্ত পৌঁছোলই না। নিজের চোখে দেখলাম ও ঘন জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ল। ঠিক তখনই কানফাটানো শব্দে বাজ পড়ল। কী ভয়ংকর সেই শব্দ! আমি থরথর করে কেঁপে উঠলাম আবারও। মুহুর্মুহু বজ্রপাত শুরু হয়ে গেল।

এমন অসময়ে বাজ পড়াটাও অমঙ্গলের পূর্বলক্ষণ। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম কয়েকমুহূর্ত। তখনই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হল। আর তার সঙ্গে প্রবল ঠান্ডা হাওয়া। সে কী বৃষ্টি! চারদিকে অন্ধকার আর বর্শার

ফলার মতো বৃষ্টির প্রতিটা ফোঁটা গায়ে বিঁধছে।

উফ, ভগবান! এ কী হচ্ছে! আমার মন বলছিল আজ কিছু একটা হতে চলেছে, খুব খারাপ কিছু একটা হয়তো...হয়তো আজ আমার আর উৎপলের জীবনের শেষ দিন। কীভাবে মরব কেউ জানতে পারবে না, কী ঘটেছিল তাও অজানা থাকবে। আমাদের প্রিয়জনেরা হন্যে হয়ে অনেকদিন এদিক-ওদিক খুঁজবে। তারপর একদিন হতাশ হয়ে খোঁজাখুঁজি বন্ধ করে দেবে। তারপর বহুকাল পরে হয়তো আমাদের বেওয়ারিশ মৃতদেহ এই জঙ্গলেরই কোথাও পড়ে থাকতে দেখবে...ততদিনে কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না—

নিজের অজানা মর্মান্তিক মৃত্যুকে কল্পনা করে আবার শিউরে উঠলাম আমি। আচমকাই নিজেকে ধমক দিয়ে উঠলাম। নিজেকে বললাম, এইসব ভাবনা আমাকে বিবশ করে তুলছে। এসব আমি কী ভাবছি? ছি ছি! মৃত্যু যদি আসেই তাহলে এত ভয় পেয়ে কেন মরব? যে অশুভশক্তির বিরুদ্ধেই লড়তে হোক না কেন, প্রাণপণে লড়াই করেই মরব।

মনে অসম্ভব জোর নিয়ে বৃষ্টি আর মেঘের ডাককে ছাপিয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটতে শুরু করলাম, অন্ধকার হয়ে আসা জঙ্গলের ভেতর! উৎপল উৎপল! তুই কোথায় সাড়া দে...সাড়া দে...।

কিছুই প্রায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। উল্টোপাল্টা ছুটছি শুধু। উৎপল! তুই কোনদিকে? সাড়া দে ভাই উৎপল?

বেশ কিছুক্ষণ চিৎকার করার পর একটা ক্ষীণ সাড়া পেলাম, এদিকে আয়। আমি এখানে।

অনেক দূর থেকে সাড়া এল উৎপলের। কোন দিক থেকে...কোন দিক থেকে সাড়া দিল ও? আমার মাথা আর কাজ করছে না। বৃষ্টির জলে জঙ্গলের মাটি এতটাই নরম আর পিছল হয়ে গেছে আমি বারকয়েক দৌড়নোর চেষ্টা করে কাদাজলের মধ্যে হুমড়ি খেলাম। বেশ কয়েক জায়গায় কেটে-ছড়ে গেল। তারমধ্যে বৃষ্টিতে ভিজে এত শীত করছে যে দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। চোয়াল কাঁপছে থরথর করে।

কী করব এবার? অসহায়ভাবে আমার চারদিকে তাকালাম। শুধুই কালোকালো ভূতের মতো লম্বা লম্বা গাছ। ভয় আমাকে আবারও চেপে ধরতে শুরু করল...আমি সেই ভয় কাটানোর জন্য আবারও গলা তুলে উৎপলকে ডাকতে গেলাম, কিন্তু পারলাম না! এবার ওকে ডাকতে গিয়ে দেখলাম, আমার গলা দিয়ে আর আওয়াজ বেরোচ্ছে না। চোয়াল দুটো থরথর করে কাঁপছে! এবার...এবার কী হবে? উৎপলকে কীভাবে খুঁজে বার করব?

বিদ্যুৎচমকের মতো আমার মনে পড়ল ছেলেবেলার কথা। পাড়ার বন্ধুরা বিকেলে নানারকম খেলতাম। তারমধ্যে সবথেকে প্রিয় খেলা ছিল লুকোচুরি। ওই খেলার সময় একে অপরকে ইশারায় আমি কোথায় লুকিয়েছি বোঝানোর জন্য শিস দিতাম। মুখে দুই আঙুল পুরে ঠিক দুইবার শিস! উৎপল আমার ছেলেবেলার বন্ধু হওয়ার সুবাদে এই পদ্ধতিটা ওরও জানা। খেলার বয়স পেরিয়ে যখন বড় হয়েছি তখন বয়সোচিত দুষ্টুমিতে এই শিস বহুবার ব্যবহার করেছি। বন্ধুমহলে আমার শিসের জোর ছিল সবথেকে বেশি। আজ এই বিপদে সেই পুরোনো অভ্যাসকেই আবার ফেরানোর চেষ্টা করলাম। মুখে আঙুল পুরে দিয়ে সেই পুরোনো দিনের মতো শিস দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

এ কী! শিস বাজছে না কেন? হে ভগবান! আবার চেষ্টা করলাম। এত বছরের অনভ্যাস, কিছুতেই পারছি না। তবু হাল ছাড়লাম না। একটাই শেষ রাস্তা ভেবে বার বার চেষ্টা করতে করতে একসময় অবশেষে তীকষ্নস্বরে বেজে উঠল।

ঠিক দুইবার বাজিয়ে আমি রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকলাম সাড়া পাবার জন্য। নাহ, কোনও সাড়া নেই। শুধু জঙ্গলের গাছের পাতায় বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ। জানি না, আর কতক্ষণ এই ঘন জঙ্গলে টিকে থাকতে পারব, কারণ বৃষ্টির জলে আমার পায়ের পাতা ডুবে যাচ্ছে, ঠান্ডার চোটে অবশ হয়ে যাচ্ছে শরীর। আর কতক্ষণ এই প্রতিকূলতার সঙ্গে যুঝতে পারব, জানি না।

শিসের কোনও উত্তর না পেয়ে হতাশ হয়ে যাচ্ছিলাম, তখনই শুনলাম ক্ষীণ শিসের শব্দ। হ্যাঁ, ওই তো! ওই তো উপস্থিতি জানাচ্ছে উৎপল। আমাকে পৌঁছতেই হবে বন্ধুর কাছে। শব্দের উৎস আন্দাজ করে আমি ওই অন্ধকারের মধ্যেই দাপাদাপি করে ছুটে এগোতে থাকলাম।

তখনও বুঝিনি এই শিস দেওয়াটাই আমার জীবনের অন্যতম ভুল হয়ে যাবে।

খানিকপরেই মনে হল আবারও শিসের শব্দ এল। ঠিক দুইবার। এবারে আমার বাঁ-দিক থেকে। তাহলে কি ওই দিক থেকে আসছে? আবার হাঁচোরপাঁচোর করতে করতে সেই দিকে ছুটলাম আমি। হয়তো এই গহীন অরণ্যের ভেতর কোনও শ্বাপদের দাঁতনখ কিম্বা বিষাক্ত সাপের ছোবল আমার জন্য অপেক্ষা করছে। যে-কোনও মুহূর্তেই আছড়ে পড়তে পারে আমার ওপর।

কিন্তু সেসব বিপদের কথা এখন আমার কাছে তুচ্ছ মনে হচ্ছে। একমাত্র প্রিয় বন্ধু উৎপলকে এই ভয়ংকর বিপদ থেকে রক্ষা করা বা সত্যি বললে নিজেকে একা না হতে দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা আমাকে অস্বাভাবিক সাহসী করে তুলল। ওই দিকে খানিকটা যেতেই আবার শিসের শব্দ পেলাম। এবার সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে। এসব কী হচ্ছে? আমি কি ভুল শুনছি?

একজনের শিসের শব্দ দুই দিক থেকে কী করে আসবে? হ্যাঁ, ভুলই শুনছি। ভাবতে না ভাবতেই আবারও শিস। কোন দিকে যাব এবার? পুরো দিশেহারা। মনে হচ্ছে, অনেকে মিলে আড়াল থেকে যেন আমার সঙ্গে মশকরা করছে। তবু এর শেষ দেখে আমি ছাড়ব। জেদ চেপে গেল। যেদিকে শিসের শব্দ পেলাম, সেদিকে ছুটতে শুরু করলাম।

বৃষ্টির আর বাজ পড়ার শব্দ ছাপিয়ে উৎপলকে প্রাণপণে ডাকছি! সহসাই মাথা থেকে একটা কনকনে ঠান্ডা যেন পিছলে পায়ের দিকে নেমে গেল, কে যেন এবার আমার নাম ধরে ডাকছে। কে? কে ডাকল? হে ঈশ্বর এসব কী হচ্ছে! এই দুর্যোগের মধ্যে আমাকে কে ডাকছে? কাদা আর বৃষ্টির প্রকোপের জন্য আমি আর এগোতে পারছি না।

আমার পা-দুটো মাটি আঁকড়ে ধরেছে। মনে হচ্ছে এবার মাটিতে থেবড়ে বসে পড়ি, তারপর এখানে আমার মরণ হোক। কিন্তু পরক্ষণেই অন্তরাত্মা আমাকে শেষ পর্যন্ত লড়ার সাহস দিচ্ছে। মরার আগে পর্যন্ত কিছুতেই ভয়ে মরব না। শেষবারের মতো আবার লড়াইয়ের শক্তি সঞ্চয় করলাম। এই শিস কি কোনও ইঙ্গিত বহন করছে? আমার শিসের উত্তর আদৌ উৎপল দিচ্ছে, নাকি অন্য কেউ বা কারা? কারা উসকে দিচ্ছে আমার—আমার এই শিসকে? ভাবামাত্র আমার কানের কাছে কে যেন বলে উঠল, 'পালা পালা! ওরা এসে গেছে!'

কে? কে বলল এই কথা? আমি তাকে দেখতে পেলাম না, কিন্তু শুনতে পেলাম আমার পাশ দিয়ে অদৃশ্য কেউ একজন ছপছপ শব্দ করতে করতে ছুটে গেল। কে বলে গেল—পালা? কারা আসছে?

হ্যাঁ, সত্যি-সত্যিই অনেকগুলো ভারী বুটের শব্দ! সঙ্গে বাঁশির শব্দ! বুট...বাঁশি...পুলিশ! এই জঙ্গলে এই দুর্যোগে পুলিশ বাহিনী কেন আসছে? কাকে খুঁজতে আসছে? আর এখানে এলই বা তারা কী করে?

আবারও পৃথিবী কাঁপিয়ে বাজ পড়ল। আর বজ্রের ঝলকে আমি স্পষ্ট দেখলাম, মাত্র কয়েক গজ দূরে সাদা জামা আর হাফপ্যান্ট পরা একটা অল্পবয়েসি ছেলে দৌড়ে পালাচ্ছে।

কে ও? কেন পালাচ্ছে? কাদের থেকে? আমার পিছনে বুটের শব্দগুলো আরো জোরালো হচ্ছে। দৌড়োতে থাকা ছেলেটা আচমকা থমকে দাঁড়াল! তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কৃষ্ণ, পালা! ওরা এবার নইলে আমাদের ধরে ফেলবে।'

কৃষ্ণ, আমি কৃষ্ণ! উৎপলের গঙ্গাদাদুর বাল্যবন্ধুর নাম কৃষ্ণ। তাহলে... তাহলে ওই যে সামনের ছেলেটি ও কি তাহলে...? আমি আবারও শিউরে উঠলাম।



দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

অষ্টম পর্ব

হঠাৎ করেই কেমন যেন মনে হচ্ছিল, স্মৃতির বন্ধ দরজাটা একটুখানি সরে গিয়েছে। তার ওপাশ থেকে উঁকি মারছে যেন বহু পুরোনো একটা মুখ! ও মুখ আমি...

তুমি...তুই...

পেছনে ঝোপঝাড় ভেঙে পায়ের শব্দগুলো আরো কাছে এগিয়ে এসেছে। চাপা গলায় দু-একটা কথাবার্তার টুকরো ভেসে আসছিল। একটা কুকুরের গলার গম্ভীর ডাক...

'সার, কুকুরটা গন্ধ পেয়েছে। এখানেই কোথাও...'

'ইয়েস! সাবধান! পায়ে গুলি করিবে। আই ওয়ান্ট দোজ ডেভিল অ্যালাইভ ফর আ ফিউ আওয়ার্স। খতম করিবার পূর্বে ইহাদের ইনটারোগেট করা প্রয়োজন।'

কেমন যেন অবশ হয়ে আসছিল আমার শরীর। আস্তে আস্তে হাঁটু মুড়ে ভেজা মাটির ওপর বসে পড়ছিলাম আমি। আমার শরীরে ভেজা মাটির ভ্যাপসা গন্ধ! ক্রমাগত ঝরে পড়া বৃষ্টির একঘেয়ে শব্দ একটা দমচাপা নৈঃশব্দ্যের ঢাকনা গড়ে তুলেছে আমাকে ঘিরে। আর সেই নৈঃশব্দ্যকে ছিঁড়েখুঁড়ে কুকুরের গলার গম্ভীর ডাকটা ক্রমশ এগিয়ে আসছিল কাছে...আরো কাছে...

ছেলেটা দাঁড়িয়ে পড়েছে খানিক দূরে। ওর ছায়া ছায়া শরীরটা ঘুরে দঁড়িয়েছে আমার দিকে। একটুকরো ঝাপসা কুয়াশার মতো অবয়বটার ভেতর থেকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখদুটো আমার বুকের ভেতরটাকে খুঁড়ে দেখে নিচ্ছিল যেন। এতটা দূর থেকেও সে দৃষ্টির উষ্ণতা ছুঁয়ে যাচ্ছিল আমাকে।

একটু বাদে ঠোঁটে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটিয়ে তুলে, মসৃণ গতিতে আমার কাছে এগিয়ে এল ও। কোথাও একটা অস্বাভাবিকতা ছিল তার চলার ঢঙ-এ। আর তারপরই খেয়াল হল পা-ফেলে চলবার যে স্বাভাবিক দুলুনি সেটার অভাব রয়েছে ওর হাঁটায়। যেন মাটিকে না ছুঁয়ে...

অস্বস্তিকর ভাবনাটা সম্পূর্ণ করবার অবসর আমাকে দিল না ও। দেখতে দেখতে আমার একেবারে সামনে পৌঁছে গিয়ে স্থির হয়ে গেল ওর ছায়াশরীর।

'কৃষ্ণ! উঠে দাঁড়া। আমার দিকে তাকিয়ে দ্যাখ! আমি...'

বলতে-বলতেই ওর হাতটা নেমে এসে আমার হাতটাকে ছুঁল। একটা বরফঠান্ডা বিদ্যুৎ যেন ওর হাত বেয়ে আমার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। কুয়াশার মতো একটা অন্ধকারের স্রোত ছেলেটার দেহ থেকে বের হয়ে ঢেকে দিচ্ছিল চারপাশটা...সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে তীকস্ন আলোর ছুরির মতো ওর দৃষ্টি এসে বিঁধে যাচ্ছিল আমার চোখে! শিউরে উঠে অনুভব করছিলাম, পুড়িয়ে দেওয়া উত্তাপের একটা সূক্ষ্ম স্রোত আমার চোখদুটোকে ধাঁধিয়ে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে মস্তিষ্কের আনাচ-কানাচে...

চোখ বুজে ফেললাম আমি। মাথার মধ্যে একটা ভূমিকম্প চলছে যেন আমার। সবকিছু ভেঙেচুরে দিয়ে সেখান থেকে উঠে আসছিল, যেন অন্য কোনও জন্মের হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি। ভুলে যাওয়া একটা সময়...হারিয়ে যাওয়া একটা জীবন

'কৃষ্ণ, আর দেরি নয়। ওরা...'

হঠাৎ চোখ খুলে উঠে দাঁড়ালাম আমি। চারপাশের জঙ্গল যেন আরও বেশি গভীর হয়ে উঠেছে। মাথার ওপর গাছের ঘন ঢাকনা পেরিয়ে আকাশের আলো এসে পৌঁছয় না এখানে। মুষলধারায় বৃষ্টির জল তার ফাঁক দিয়ে নেমে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছিল আমাদের। কুকুরের গলার গম্ভীর ডাকটা এবারে আরও কাছে...আরও নিশ্চিত, আরো ক্রুর হয়ে উঠেছে। কাদার বুকে ছুটন্ত জুতোর শব্দগুলোকে অনেকখানি পেছনে ফেলে, আমাদের লক্ষ্য করে ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছিল ওর ডাকটা।

শিকারের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে খুনে জন্তুটা! আর তাই, মালিকের ফিতের বাঁধন ছাড়িয়ে, তাদের পেছনে ফেলে সে এবারে ধেয়ে আসছে তার শিকার-দুজনকে লক্ষ্য করে!

একনজর সেদিকে ঘুরে দেখে ফের সামনে দাঁড়ানো ছেলেটার দিকে ফিরলাম আমি। হ্যাঁ! আর কোনও দ্বিধা নেই, কোনও সংশয় নেই আর! ওকে আমি চিনি। বড় ঘনিষ্ঠভাবেই চিনি। আমি কৃষ্ণ। একদিন অগ্নিমন্ত্রে আমার হাতেই দীক্ষা পেয়েছিল এই কিশোর। মাতৃভূমির পরাধীনতার শিকল খোলবার জন্য জীবনপণ করে ঘরও ছেড়েছিল আমারই হাত ধরে।

তার সেদিনের দৃপ্ত মুখটা বড় মনে পড়ে যাচ্ছিল আমার। মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের দিকে তুলে বলেছিল, তুই সঙ্গে থাকিস যদি কৃষ্ণ, দেখে নিস, এই হাত একদিন ওই সাম্রাজ্যবাদীর সিংহাসনের ভিত নাড়িয়ে দেবে!

বক্সা ফোর্টের জেলখানার অসীম যন্ত্রণা সইতে সইতে একসময় সেই চোখের দীপ্তি ম্লান হয়ে এসেছিল। আর তারপর, প্রথম যেদিন জেল ভেঙে পালাবার পরিকল্পনাটা ওকে বললাম, সেদিন কী আনন্দ তার! ফের ফিরে এসেছিল তার চোখের আলো। আমার হাতদুটো জড়িয়ে ধরে বলেছিল, আমি জানতাম, তুই ঠিক এখান থেকে বের হবার রাস্তা খুঁজে নিবি।

বড় ভরসায় আমারই ওপর আস্থা রেখে জেল থেকে পালাবার পথে আমার সঙ্গী হয়েছিল ও। আর এখন, ঘন বৃষ্টির মধ্যে এই অজানা, দুর্গম জঙ্গলে, পেছন থেকে ক্রমশ এগিয়ে আসা খুনে কুকুরটার ডাক শুনতে শুনতে একটা তেতো স্বাদ ছড়িয়ে পড়ছিল আমার মুখে। ওর সেই ভরসার মর্যাদা রাখতে পারলাম না আমি! নিজের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা তাজা প্রাণকেও নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে টেনে নিয়ে এলাম!

কাঁদছিলাম আমি। কাদার বুকে উবু হয়ে বসে দুহাতে মাথাটা চেপে ধরে কান্নার ধাক্কায় বারবার কেঁপে উঠছিল আমার শরীরটা। বৃষ্টির ধারায় মিশে যাচ্ছিল আমার চোখের নোনতা জল। একটা তীব্র হতাশায় বুকের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছিল আমার...স্বপ্ন দেখেছিলাম, অস্ত্র হাতে একটা লড়াই দিয়ে কয়েকটা সাদা চামড়াকে জমিতে শুইয়ে শহিদ হব একদিন। এভাবে অসহায় বুনো জন্তুর মতো সে-স্বপ্ন আমাদের শেষ হয়ে যাবে এ আমি ভাবিনি।

আর কোনও আশা নেই। আর কোনও স্বপ্ন নেই। সেই সবকিছুকে ডুবিয়ে দিয়ে তখন মৃত্যুর পদধ্বনির মতো বেজে উঠছে বৃষ্টির আওয়াজ, শিকারি কুকুরের গর্জন আর দূরাগত ওই বুটের শব্দগুলো।

'কৃষ্ণ! এভাবে বসে থাকলে হবে না। কিছু একটা করতে হবে আমাদের! ওঠ তুই। উঠে দাঁড়া...'

কথাগুলো শুনে আমি মুখ তুলে তাকালাম তার দিকে। আমার কাঁপা কাঁপা গলাটা, একটা অচেনা উচ্চারণে তখন বলছিল, 'পলানোর রাস্তা নাই রে গঙ্গা। আইজ এইহানেই আমরা...'

শুনে একটা বিষণ্ণ দৃষ্টি ফুটে উঠল যেন ছেলেটার চোখে। আমাদের মাথার ওপর পাতার ছাদে বৃষ্টির আওয়াজ আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। ভীত প্রাণীর মতো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল সে। নিজের ভরসার জায়গাটিকে এমন অসহায়ভাবে ভেঙে পড়তে দেখে এইবার খানিক দিশাহারা হয়ে পড়েছে সে-ও।

আর তারপর, হঠাৎ তার চোখ পড়ল বাঁ-দিকে ছড়িয়ে থাকা কাঁটালতার একটা জঙ্গলের দিকে। কাছাকাছি দাঁড়ানো গাছগুলোর ডাল থেকে ডালে ছড়িয়ে থাকা একটা দুর্ভেদ্য জাল যেন। তাদের চকচকে সবুজ পাতাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বাঘের নখের মতো বাঁকানো অজস্র কাঁটা। জোলো হাওয়ার ঝাপটায় প্রায় মাটি ছুঁয়ে থাকা কাঁটাভরা লতার দল হিংস্র জন্তুর থাবার মতো দুলছিল গোটা এলাকাটা জুড়ে।

সেদিকে একনজর দেখেই সে উবু হয়ে বসে পড়ল কাদামাটির ওপর। তারপর ইশারায় আমাকে ডাক দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে, ঝুলন্ত লতার কাঁটার খোঁচাকে উপেক্ষা করে এগিয়ে গেল জঙ্গলটার ভেতরে।

তাকে অনুসরণ করে, বুকে হেঁটে কোনওমতে সেই কাঁটাজঙ্গলের গভীরে ঢুকে যাচ্ছিলাম আমি। বাঁচবার আকুল প্রবৃত্তিতে সারা শরীরে তাদের আঁচড়ের যন্ত্রণাকে টেরও পাচ্ছিলাম না যেন।

কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে থামতেই হল। হাতের ধাক্কায় ছিঁড়ে যাওয়া একটা কাঁটাওয়ালা লতা গাছের ডাল থেকে সপাটে আছড়ে পড়েছে আমার শরীর জুড়ে। আমার গালের নরম মাংসে আটকে গেছে তার বাঁকানো কাঁটাগুলো।

আমি থামতে খানিক সামনে গঙ্গার ছায়া ছায়া শরীরটাও স্থির হয়ে গিয়েছিল। সারা শরীর জুড়ে কিলবিল করে ছোবল বসাতে থাকা লতাটার বাঁধন ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতেই দেখছিলাম, দুর্ভেদ্য সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একখণ্ড ঘন কুয়াশার মতোই বাধাহীনভাবে আমার কাছে ফিরে আসছে সে।

কাছাকাছি পৌঁছে আধো অন্ধকারের ভেতর ওর জ্বলজ্বলে চোখদুটো আমার দিকে চেয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর নীচু হয়ে মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'ওই শোন!'

কথাটা বলবার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের গলার গম্ভীর ডাকটা ফের বেজে উঠল! এবার তা আরও কাছে।

'টেডি! রবার্ট সাহেবের শিকারের কুকুর। তুই তো জানিস কৃষ্ণ! গন্ধ শুঁকে ও দশ মাইল দূর থেকে শিকার খুঁজে বের করতে পারে! ঝোপটার বাইরে এসে পৌঁছে গেছে। এইখানটায় না ঢুকে এলে এতক্ষণে আমাদের ছিঁড়ে ফেলত। এখানে আর একটুও সময় নষ্ট করলে...'

আমার হাতের টানে চামড়া ছিঁড়ে বের হয়ে আসছিল রক্তমুখী কাঁটাগুলো। কাঁটাশুদ্ধ লতাটাকে ছুড়ে ফেলে দিতে দিতে চারপাশে একনজর দেখে নিয়ে বললাম, 'আর সময় নষ্ট নয়! আমরা ফান্দে পড়ছি রে...'

'উঁহু, রাস্তা আছে! কান পেতে শোন।'

এইবার শব্দটা কানে এল আমার। কাঁটাঝোপের জঙ্গলটার পেছন দিকে অনেকটা দূর থেকে ছুটন্ত জলের আওয়াজ!

'পানিঝোরা!' আধো অন্ধকারে ঝকঝকে দাঁতে নিঃশব্দ একটা হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে, 'এদিক দিয়ে বয়ে গিয়ে রবার্ট সাহেবের বাংলোর পাশ দিয়ে ঝরনা হয়ে নেমেছে। ওর বুকে গিয়ে একবার নামতে পারলে টেডির সাধ্য হবে না আমাদের গন্ধকে ফলো করে। চল, চল। কুইক।'

বলতে বলতে বড় বড় পদক্ষেপে কাঁটালতার জঙ্গল ফুঁড়ে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ফের একবার পেছন ঘুরে বলল, 'মাথা উঁচু করিস না। বুকে হেঁটে আয়। কাঁটা লাগবে না।'

'কিন্তু গঙ্গা, তুই তবে কীভাবে...'

আধো অন্ধকারের মধ্যে একটা ম্লান হাসি খেলে গেল ওর মুখে, 'আমার কথা বাদ দে। এখন নে। চল। প্রত্যেকটা মুহূর্ত মূল্যবান।'

থকথকে কাদায় বুকে হেঁটে কাঁটাঝোপের খোঁচা খেতে খেতে যেন অনন্ত সময় পার হয়ে যাচ্ছিলাম আমি। সামনে আধো অন্ধকারে এগিয়ে যেতে থাকা ছায়ায় গড়া শরীরটা যেন চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে চলেছে আমায়! অবিশ্রান্ত মেঘের ডাক আর বৃষ্টির শব্দ; একই সঙ্গে ক্রমশ বেড়ে উঠছিল পানিঝোরার আচ্ছন্ন করা জলের আওয়াজ। আর, তার সঙ্গে, আশপাশ থেকে মাঝে মাঝে যেন মিশে যাচ্ছিল কাদায় বুট পরা পায়ের হালকা থপ-থপ শব্দ, অথবা, কখনো কখনো বাঁয়ের দিকে একটা কুকুরের দূরাগত ডাক।

কিন্তু সেই মুহূর্তে সেই মৃদু শব্দগুলো কোনও অর্থ বয়ে আনছিল না আমার কাছে। সামনের ছায়া ছায়া শরীরটাকে লক্ষ্য করে আচ্ছন্নের মতো কেবল এগিয়ে চলেছি।

একসময় কাঁটাঝোপের জঙ্গল শেষ হয়ে এল। এখানে হালকা ঢালের গায়ে বড় বড় গাছগুলোর কোমর অবধি লকলকিয়ে উঠেছে ঝোপঝাড়। তার ফাঁক দিয়ে মাঝে-মাঝেই সাদা দাঁতের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠছিল খানিক দূরে ছুটন্ত স্রোতটার ফেনা।

বাঁচতে হলে ওই অবধি পৌঁছোতে হবে। উঠে দৌড়ে সেদিকে এগোতে যাব, ঠিক তখন হঠাৎ পেছন থেকে দুটো বরফের মতো ঠান্ডা হাত এসে থামিয়ে দিল আমায়। চমকে উঠে খেয়াল করলাম, ছেলেটা আর আমার সামনে নেই। অজান্তে কখন যেন একেবারে আমার পেছনে গা-ঘেঁষে হাজির হয়েছে এসে। ওর

বৃষ্টিভেজা শরীর থেকে মাটিমেশা হালকা দুর্গন্ধ উঠে আসছিল আমার নাকে। গা-গোলানো, পচাটে গন্ধ একটা!

'থাম, কৃষ্ণ! ওই শোন...'

কুকুরের গম্ভীর ডাকটা ঠিক তখনই বৃষ্টি আর হাওয়ার শব্দকে পেরিয়ে ঝাঁপিয়ে এল যেন আমাদের দিকে। ঝোপজঙ্গল ছিঁড়ে এদিকে এগিয়ে আসছিল তার প্রকাণ্ড কালো শরীরটা। তার বাদামি মুখে ক্রুর হিংস্রতা নিয়ে যেন জ্বলছে দুটো চোখ।

'একটা ফাঁদ! শয়তানগুলো আন্দাজ করেছিল আমরা কোনদিকে যাব। তাই ঝোপগুলোকে বেড় দিয়ে আগে থেকেই এইখানে এসে...'

বলতে-বলতেই হঠাৎ আমার কাঁধদুটো ছেড়ে দিয়ে সে ছিটকে গেল সামনের দিকে। কুকুরটা তাকে নজর করেছে। কালো বিদ্যুতের মতো ধেয়ে যাচ্ছে ওর ছায়া ছায়া শরীরটাকে লক্ষ্য করে।

হাতে সময় নেই আর। ওকে বাঁচাবার কোনও উপায় নেই। হঠাৎ মাটিতে শুয়ে পড়ে ডানদিকে ঢালের কাদামাখা গা বেয়ে আমি গড়িয়ে গেলাম সামনে ছুটন্ত ঝোরার জলের দিকে। গড়িয়ে যেতে যেতেই চোখে পড়ছিল, কালো শরীরটা ঝাঁপিয়ে পড়েছে ছেলেটার ওপরে...পরমুহূর্তেই একটা শক্ত হাত এসে আমার কাঁধটাকে চেপে ধরল। মুখটা ঘুরিয়ে তার দিকে চোখ ফেলেই হঠাৎ একটা পাষাণভার যেন সরে গেল আমার বুক থেকে। ঝাপসা চোখে বললাম, গঙ্গা তুই...

গঙ্গা? তার মানে? কাকে কী বলছিস তুই? এই অতীন...আমি...

আস্তে আস্তে আমার ঝাপসা দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে মুখটা ফুটে উঠছিল সামনে। সেই পরিচিত ডৌল, চোখের পরিচিত শাণিত, কৌতুকভরা দৃষ্টি। বড় চেনা মুখ গঙ্গা না না, উৎপল প্রিয় বন্ধুটি আমার! উদ্বিগ্নচোখে সে তাকিয়ে ছিল আমার মুখের দিকে।

এখানে এই জলের ধারে এসে কী করছিলি তুই? অ্যাঁ? দিব্যি যাচ্ছিলাম, তা হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে দেখি বাবু উধাও। উধাও তো উধাওই। খুঁজে খুঁজে মাথা খারাপ হবার জোগাড় আমার! মাথায় শুধু ঘুরছে, সঙ্গে করে নিয়ে এলাম, এখন কিছু একটা হয়ে গেলে ফিরে গিয়ে কী জবাব দেব? এখানে এসে পৌঁছলি কী করে তুই বল তো? আর একটু হলেই তো ওই স্রোতের ভেতর পড়ে...

আমি কোনওমতে পেছনের জঙ্গলটার দিকে ইশারা করে বললাম, ও...ওরা...টেডি...রবার্টের কুত্তা...ছেলেটাকে ও...

কী সব বাজে বকছিস, বল তো? টেডি, রবার্ট কোথায় কী? ওঠ। সারা গায়ে তো কেটেকুটে একশা করেছিস। কাঁটাবনে হামাগুড়ি দিচ্ছিলি নাকি, অ্যাঁ? নে, আমার কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে চল দেখি।

প্রিয় বন্ধুর হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। বড় ভালোবাসি ওকে। ভরসা করি চিরকাল। চিরটাকাল তো আমার বিপদে ও-ই এসে পাশে দাঁড়ায়। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

ফিরে যেতে যেতে পেছনদিকে তাকিয়ে দেখলাম একবার আমি। সেখানে, বৃষ্টির পর্দায় ঢাকা নির্জন জঙ্গলে জনপ্রাণীর চিহ্ন ছিল না।



অভীক মুখোপাধ্যায়

নবম পর্ব

উৎপলের কাঁধে ভর দিয়েই কটেজে ফিরলাম। আমার অবস্থা করুণ। হাত-পাগুলো বাঘনখের কাঁটায় ছিঁড়েকুটে একাকার। জামাকাপড় ফর্দাফাঁই। গা'ময় কাদামাটি। কপালের ডানদিকটা আলুর মতো ফুলে আছে। লালচে ভাব। প্রচণ্ড ব্যথা। জঙ্গলের মধ্যে দৌড়ানোর সময় হয়তো গাছের গুঁড়িতে বা ডালে বাড়ি খেয়েছিলাম। এখন আর আমার কিছুই মনে পড়ছে না।

এলাকাটায় একটা সময়ে ব্রিটিশ সাহেবরা শাল-সেগুনের মনোকালচার করেছিল। চারিদিকে শুধু গাছ আর গাছ। যতদূর চোখ যায়, যেন যত্ন করে বিছিয়ে রাখা একটা সবুজ জাজিম। আমাদের ওদিকে সবুজের এমন বাহার আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তবে এখন মনে হচ্ছে যে, এ জিনিস যেমন সুন্দর, তেমনি ভয়ংকর। যতটা স্নিগ্ধ, ততখানিই উগ্র। একসময়ে বনদেবীর এই রূপটাই আমাকে মুগ্ধ করেছিল। এখন এই ইঁদুরের মতো আটকা-পড়া অবস্থায় জঙ্গলের সবুজটাকে বিষ মনে হচ্ছে।

এই বনে কিছু একটা আছে, যা আমাকে আর আমার মধ্যে থাকতে দিচ্ছে না। উৎপল বনের ভেতরে যখন আমাকে দেখতে পায়, তখন আমি নাকি উন্মত্তের মতো 'শয়তান...শয়তান...' বলে চিৎকার করতে-করতে ছুটে বেড়াচ্ছিলাম! ও এসে না-সামলালে আমি নাকি গিয়ে পড়তাম তুফান খেলতে থাকা পানিঝোরার জলে!

শোন, জামাকাপড়টা বদলে নে। ঝোরার জলে হাত-পা ভালো করে ধুয়েছিস জানি। তবু তোর গায়ের ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলোকে আরেকবার জলে ধুয়ে শিগগির মলমটা লাগাতে হবে। বলেই উৎপল উঠে গিয়ে ব্যাগ থেকে ফার্স্ট এইড কিটটা বের করে এগিয়ে দিল।

কাজগুলো যাহোক করে সেরেই আমি খাটে শুয়ে পড়লাম। মাথাটা যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে। একটা ডিজিনেসও যে রয়েছে, সেটা হাঁটার সময় বেশ ফিল করছিলাম।

বাইরে সমানে বৃষ্টি পড়ছে। সঙ্গে বাড়ছে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট। ঝড়ের ভয়ে বনের দিকের গাছগুলো যেন একে অপরকে জড়িয়ে ধরছে। ভয়ে নাকি সোহাগে, কে জানে? থেকে থেকে নরম অন্ধকারটা হয়ে উঠছে মিশকালো। আর তারই মাঝে কয়েক সেকেন্ড পর পর একবার-দুবার করে ঝিকিয়ে উঠছে নীল-সাদা বিদ্যুৎ। দেখলে মনে হয়, কোনও এক ডাইনি বুড়ির কাপাস-তুলোর মতো একমাথা সাদা চুল এলোমেলোভাবে উড়ছে ঝড়ের হাওয়ায়।

আমাদের সমতলের নির্জন ঝোড়ো রাত তবু একরকম—গহন অন্ধকারেও গাছের পাতায় কিংবা ঝোপঝাড়ে গয়নার মতো করে জোনাকি জ্বলে, ঝিঁঝির ডাক শোনা যায় একটানা। এখানে কিচ্ছু নেই। শুধু হাওয়ার তাণ্ডব। পাল্লা দিয়ে শীত বাড়তে থাকছে। বৃষ্টির ফোঁটা ক্রমশ যেন বিন্দু থেকে গোলকে পরিণত হচ্ছে। তবে এতকিছুর মধ্যে একটাই রক্ষে যে ইলেকট্রিক সাপ্লাইটা অক্ষত রয়েছে। কতক্ষণ থাকবে?...গাছপালা পড়ে তার ছিঁড়লে বা খুঁটি উপড়ে গেলে আগামী ক'দিনের মধ্যে ফেরার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য।

একটু চা হবে না, উৎপল?

হমম...কী বললি?

বলছি, একটু চা হলে খুব ভালো হত রে।

ছদ্ম রাগ দেখিয়ে উৎপল বলল, ভদ্রলোক এখুনি পানিঝোরার জলে সলিল সমাধি নিতে চলেছিলেন। নিজের জীবন বাজি রেখে বাঁচিয়ে-বুচিয়ে আনলাম। এবার লাটসাহেব ইজ অর্ডারিং টি। ওই যে বলে না, সাহেব চলে গেছে, আর বাবুদের রেখে গেছে। হুহ আরও কত কী দেখব, হরি!

ভাই, ভিজে গিয়ে এমনিতেই হাল খারাপ। আমার আবার ধাতটাও তেমন কড়া নয়। মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে। মনে হচ্ছে মাথার ভেতরে কেউ একটা আধলা ইট বসিয়ে রেখেছে। একটু চা করে আন না, প্লিস!

ওকে, ওকে। আই অ্যাম অ্যাট ইয়োর সার্ভিস।

বাংলোর পেছনের বাগানটাতে রান্নাঘরখানা মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নতুন বাড়ি করে উঠে গেলে ভাঙা ভিটে যেমন পড়ে থাকে, ঠিক সেরকম। কে জানে কেন যে সাহেবরা নীল সুতোর মাপ নিয়ে কিচেন, আউটহাউসগুলোকে মূল বাংলো থেকে এত দূরে-দূরে বানাত? আজকাল তো অ্যাপার্টমেন্ট, এমনকী সাধারণ বাড়িগুলোতেও বিলিতি কায়দাতেই অ্যাটাচড কিচেন বা টয়লেটের কনসেপ্টটা এসেছে। আসলে সব সভ্যতাই ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়।

বাংলোর কাঠের বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাঁ-দিকে বেঁকে রান্নাঘরে যেতে হয়। আশপাশে এত সবুজ বনানী থাকলেও আশ্চর্যজনকভাবে বাংলোর লন-এ কোথাও একটা ঘাসপাতা অবধি নেই। যেন এক রুক্ষ, অভিশপ্ত ভূমি। ছাতা আর টর্চটা নিয়ে উৎপল কিচেনের দিকে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে বলল, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দে। আমি ডাকলে তবেই খুলবি।

দরজা বন্ধ করে দিলাম। জানলা দিয়ে দেখলাম সাপ যেমন মাথায় মণির আলো নিয়ে নিজেই নিজের পথ দেখে, খাবার খোঁজে, ঠিক সেভাবেই ওর টর্চের আলোটা ইতিউতি পড়তে-পড়তে এগিয়ে গেল কিচেনটার দিকে। কিচেনের আলো জ্বলে উঠতে দেখে আমি বিছানায় উঠে শুয়ে পড়লাম।

একটু চোখ লেগে গিয়েছিল। এত হটকানির পর এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। চটকাটা ভাঙল একটা আওয়াজ শুনে! ধপাধপ...ধপ...ধপপ!

চোখ মেলতেই বুঝলাম, কারেন্ট অফ হয়ে গেছে। বাইরে ঝড়ের তাণ্ডব আরও বেড়েছে। আর সেই কালবাতাসের সঙ্গে তাল দিয়ে অনেকটাই বেড়েছে বৃষ্টির তোড়। হুড়মুড় করে একটা শব্দ হল। মনে হয়, ঝড়ে উপড়ে গেল বাংলোর পাশেরই কোনও একটা গাছ। এবার আমার বেশ ভয় করছে।

ধপ...ধপপ...ধপপ...!

আবার হল আওয়াজটা। মনে হচ্ছে, কোনও জানলা খোলা থেকে গেছে। দামাল হাওয়াতে সেটাই পড়ছে বোধহয়। কাচের জানলা। এভাবে পড়তে থাকলে কাচ ভেঙে খানখান হয়ে যাবে। অন্যের সম্পত্তিতে এসে যখন আছি, সেটাকে দেখাশোনা করা বা সামলানোর দায়িত্বটাও আমাদেরই।

ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। তবে বাইরে যেহেতু বাজ পড়ছে, সেই আলোতেই মাঝে মাঝে চমকে উঠছে ঘরটা। হাতড়ে মোবাইলটা খোঁজার চেষ্টা করলাম। পেলামও। কিন্তু ব্যাড লাক, ব্যাটারিতে চার্জ নেই। উৎপল কতক্ষণ আগে গেছে এবং কেন ফিরছে না সেটা বোঝারও রাস্তা নেই। এবার কিচেনের দিকের জানলা খুলে হাঁক মারাই একমাত্র রাস্তা। আচ্ছা, ঝড়ে উপড়ে পড়া গাছটার জন্য ও বাংলোর সামনের দিকটাতে আসতে পারছে না এমন কিছু ঘটেনি তো?

কেসটা দেখতেই হচ্ছে।

এগোতে যাব, ওই শব্দটা আবার হল! পরিষ্কার বুঝলাম, হাওয়ায় জানলা-টানলা কিচ্ছু পড়েনি, কেউ দরজায় ধাক্কা মারছে।

ভারি লজ্জায় পড়লাম। এ হেহে...উৎপল এসে কতক্ষণ ধরে দরজা ধাক্কাচ্ছে কে জানে? আর আমি ঘুমিয়ে...ইশ, আমি না জাস্ট একটা হোপলেস!

দরজাটা খুলতে যাব, ঠিক এমন সময় কেউ বীভৎসভাবে চিৎকার করে উঠল। আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। এমন কাতর আর্তনাদ আমি জীবনেও শুনিনি। যেন কাউকে হিংস্রভাবে মারা হচ্ছে!

ছিটকে দরজার কাছ থেকে কয়েকটা পা পিছিয়ে এলাম।

তবে কি উৎপল? ন...না...না, উৎপলের গলা তো এটা নয়? তাহলে কে? কে হতে পারে?

আমি জিগ্যেস করলাম, বাইরে কে আছেন? কৌন হ্যায়? কৌন চিল্লা রহা হ্যায়?

আমার প্রশ্ন করার সঙ্গে-সঙ্গেই ধাক্কা দেওয়াটা থেমে গেল। কিন্তু ওদিক থেকে কোনও সাড়া মিলল না।

বারান্দার দিকে একটা কাচের জানলা আছে। ওটা দিয়ে বারান্দাটা দেখতে যাব বলে সেদিকে এগিয়েছি, এমন সময় আবার ধাক্কা দেওয়া শুরু হল দরজায়। আরও জোরে! বার বার!

একটা গোঙানির মতো শব্দ আসছিল, অক...অক...। প্রথমদিকে আস্তে-আস্তে। পরে শব্দটা ক্রমশ ভারী হয়ে উঠল। কেউ প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাতরভাবে কাঁদার চেষ্টা করলেও কিছুতেই কাঁদতে পারছে না। সম্ভবত কেউ বা কারা তার গলা টিপে ধরেছে।

এবার সত্যি সত্যিই আমার বেশ ভয় করতে লাগল। এখানে সবকিছু স্বাভাবিক নয়। প্রথম দিকে অনেক কিছুকে হ্যালুসিনেশন ভাবছিলাম। তা নয়। উৎপলের পজিশন বুঝতে পারছি না। বাইরের লোকগুলো ওর ক্ষেত্রে থ্রেট হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু আমারই বা কী করার আছে এই মুহূর্তে? আমি হেল্পলেস।

ভয়ে গলা থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছিল না। তবুও সাহসে ভর করে বললাম, ক...কে...ওখানে?

আগের বারের মতোই এবারেও কোনও উত্তর এল না। কিন্তু এবারে অন্য শব্দ ভেসে আসছে। বারান্দায় কারা সব দ্রুত পায়ে, ভারী বুট পরে হাঁটাচলা করছে। গোঙানিটা এখনও টের পাচ্ছি। সঙ্গে সার্চলাইটের আলো। ঝড়জল ছাপিয়ে কানে আসছে হাঁফানির মতো একটা শব্দও।

ভীষণ ভয় করছে আমার। বারান্দার জানলার দিকে আর গেলামই না। কাচের জানলার কোনও ভরসা নেই। যতটা সম্ভব পা টিপে-টিপে ফিরে এলাম খাটের কাছে।

উৎপল...উৎপল তুই কোথায় গেলি? তোর কোনও বিপদ হল না তো?

বাইরে ঝড় আরও বেড়ে গেছে। বাজ পড়ছে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে। কড়কড় শব্দে খুব কাছেই একটা বাজ পড়ল। শব্দটা শোনা গেল কয়েক সেকেন্ডের ফারাকে। ঝলসে ওঠা বাজের সাদা আলোতেই জানলার কাচ দিয়ে স্পষ্ট দেখলাম বারান্দায় উঠে এসেছে, দানবের মতো একটা কুকুর।

টেডি! রবার্ট সাহেবের কুকুর!

কুকুরটাকে দেখামাত্র এই কথাগুলোই আপনা-আপনি বেরিয়ে এল। এবার জানলায় একটা হাত দেখলাম। তার ওপরে সার্চলাইটের আলো! রক্তে ভেসে যাচ্ছে হাতখানা। সঙ্গে-সঙ্গেই একটা চিৎকার ভেসে এল, 'কৃষ্ণ রে! পালা...!'

গলাটা খুব চেনা-চেনা। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি আর থাকতে না-পেরে দরজাটা খুলেই ফেললাম। ওই তো গঙ্গাচরণ! মায়ামাখা মুখ। পরনে ডোরা কাটা জামা আর খাকি কাপড়ের ঢোলা হাফপ্যান্ট। বেশ কয়েকজন সেপাই মিলে বারান্দার ওপরে ওকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে আর বন্দুকের বাট দিয়ে মারছে।

উফ, ওই মার দেখে সহ্য করতে পারা মুশকিল! ওরা কি মানুষ?

মার খেতে খেতে গঙ্গাচরণ একবার প্রদীপের টলমল শিখার মতো উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু শেষ অবধি পারল না। আছড়ে পড়ল সে। দু-হাতের নখ দিয়ে বারান্দার কাঠের মেঝেটাকে একবার আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করল, কিন্তু অতগুলো লোকের শক্তির সঙ্গে কি আর লড়া যায়! কাঠের মেঝেটাতে আঁচড়ের দাগ পড়ে গেল, নখ উঠে গেল। আর শুধুই রক্ত। উফ! আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিরশির করে উঠল দৃশ্যটা দেখে। পুলিশগুলো ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঝোরার দিকে। আর টেডি, কুকুরটা, সমানে গজরাচ্ছে।

সব কিছু আমার চোখের সামনে ঘটছে। যেন বদলে যাচ্ছে সিনেমার রিল। কিন্তু আমার মুখ থেকে কোনও শব্দ বেরোচ্ছে না। নীরব দর্শক ছাড়া কি আমি আর কিচ্ছু নই এখানে? নিয়তি কি কোনও পুরাতন গল্পের ঝাঁপি খুলে বসেছে? কে জানে।

গঙ্গাচরণ কাতরাচ্ছে! ওর সারা গা ভিজে উঠেছে ওরই রক্তে। যারা ওকে সমানে মেরে চলেছে, তাদের নির্দেশ দিচ্ছে তিনজন। একজন ভারতীয়, আর দুটো লালমুখো সাহেব। কে যেন ফিসফিস করে আমার কানে-কানে বলল, ওদের চিনতে পারছিস, কৃষ্ণ? হাতে হান্টার নিয়ে লোকটা মিস্টার জি এল লিউলিন, আর বন্দুক হাতে ওটা রবার্ট সাহেব!

হ্যাঁ, আমি এবার চিনতে পারছি। এটা তো রবার্ট সাহেবেরই কটেজ। আর ওই নরুণ-চেরা, ঘোলা চোখের লিউলিন নামের লোকটা বক্সা ক্যাম্পের আই সি এস অ্যাসিসট্যান্ট কমান্ড্যান্ট। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভারতীয় অফিসারটাকেও চিনতে পেরেছি। মিস্টার কোট্টাম, বক্সা ডিটেনশন ক্যাম্পের কমান্ড্যান্ট।

লিউলিন গঙ্গাকে বলল, ইউ ব্লাডি ইন্ডিয়ান! যুগান্টর সমিটি কোরে টোমরা আমাডের টাড়াইবে? সব স্বডেশিকে এই বক্সায় আনিয়া পিষে মারব! এই এভাবে...' বলতে-বলতেই লোকটা ভারী বুট দিয়ে চেপে ধরল গঙ্গার একটা হাতের পাতা!

আমি আর থাকতে না-পেরে চিৎকার করে উঠলাম 'গঙ্গা-আ-আ... গঙ্গা রে...!'

এবার ওরা সবাই আমার দিকে ঘুরে তাকাল। এমনকী কুকুরটাও। সকলের চোখ আগুনের ভাটার মতো জ্বলছে। এক-পা এক-পা করে কুকুরটা আমার দিকে এগোতে লাগল।

হঠাৎ ফের ধপাধপ আওয়াজ! দরজায় শব্দ হচ্ছে।



মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

দশম পর্ব

দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কেউ। বাইরে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে চলছে তুমুল বৃষ্টি। আশেপাশেই কান ফাটানো শব্দে একটা বাজ পড়ল। তার মধ্যেই দরজায় ধড়াম ধড়াম করে আওয়াজ হচ্ছে। শব্দটা বাড়ছে প্রতিনিয়ত। কে হতে পারে? ঠাহর করতে পারছি না। গলা শুকিয়ে কাঠ। বুক ধড়ফড় করছে। নিজের হৃদপিণ্ডের শব্দ নিজেই শুনতে পাচ্ছি যেন।

দরওয়াজা খুলিয়ে সাহাব!

অচেনা গলার আওয়াজ। কেউ ডাকছে বাইরে থেকে। অবাঙালি উচ্চারণ। মনের ভেতর সাহস আনার চেষ্টা করছি। কী করব সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। কেমন অস্থির অস্থির লাগছে ভেতরটা। এমন সময় উৎপলের চেনা স্বর কানে এল।

কী রে অতীন, ঘুমিয়ে পড়লি না কি?

পা টিপে টিপে এগোলাম। ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে নিলাম একবার। সন্তর্পণে খুললাম বন্ধ দরজাটা। তাকিয়ে দেখি উৎপল দাঁড়িয়ে আছে। পাশে একজন লম্বাচওড়া লোক। বয়স চল্লিশের আশপাশ দিয়ে। সাদা ঢোলা পাজামা। গায়ে ধূসর আলোয়ান। ক্রাচ আছে সঙ্গে। লোকটা জুলজুল করে দেখছে আমাকে।

আমি বেশ হকচকিয়ে গেছি। পানিঝোরা কটেজে আসার পর কী হচ্ছে আর না হচ্ছে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। এখন রীতিমতো অবাক হলাম ঘরের বাইরের প্রশস্ত বারান্দায় এসে। এতক্ষণ ঘরের ভেতর থেকে উথালপাথাল হাওয়া আর অঝোর ধারাপাতের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। সেই সঙ্গে পিলে চমকে দিয়ে বাজ পড়ছিল কড়াৎ কড়াৎ শব্দ করে। এখন বাইরে এসে দেখি, ঝড়বৃষ্টির কোনও চিহ্নই নেই। অগুনতি তারা মিটমিট করছে আকাশ জুড়ে। ক্ষয়াটে চেহারার চাঁদ পাহাড়ের মাথার ওপর। মরা মাছের চোখের মতো ম্লান আলো এসে পড়েছে বারান্দায় দাঁড়ানো ছ'ফিট লম্বা মানুষটার গায়ে। কাঁচুমাচু মুখ করে লোকটা বলল, সাহাব, আপনার কি নিদ লেগে গিয়েছিল? দরওয়াজা খুলছিলেন না, আপনার দোস্ত তো ডর খেয়ে গিয়েছিল।

আমি জিজ্ঞাসু মুখে তাকালাম উৎপলের দিকে। ইশারায় বলতে চাইলাম, কে এই লোকটা? উৎপল স্বস্তির হাসি হেসে বলল, এ হল সনাতন চৌবে। এই কটেজের কেয়ারটেকার।

আমি বিনীত ভঙ্গিতে জড়োসড়ো হয়ে থাকা লোকটাকে একবার জরিপ করলাম। গলায় বিরক্তি আর বিস্ময় মিশে গেল আমার। বললাম, কেয়ারটেকার! তা অ্যাদ্দিন কোথায় ছিল সে গুণধর?

উৎপল আঙুল দিয়ে পাহাড়ের ওদিকটা দেখিয়ে বলল, ওপাশে সদরবাজার নামে একটা জনপদ আছে। সনাতন থাকে সেই গ্রামে। বাচ্চার অসুস্থ হবার খবর পেয়ে সনাতন তড়িঘড়ি চলে গিয়েছিল। আলিপুরদুয়ারের হাসপাতালে ছেলেকে ভর্তি করাতে হয়েছিল। ডাক্তার বদ্যি করে ওর কেটেছে ক'টা দিন। সনাতনের ছেলে সুস্থ হয়েছে। আজ সন্ধেবেলা হেলেদুলে সনাতন ডিউটিতে আসছিল। পথে রিকুংয়ের সঙ্গে দেখা। আমরা পানিঝোরা কটেজে উঠেছি শুনে ব্যাটার আক্কেল গুড়ুম হবার জোগাড়। ক্রাচ নিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছে। দ্যাখ, বেচারি এখনও হাঁফাচ্ছে। জোর ভয় পেয়েছে যদি আমরা ওর চাকরি খেয়ে নিই!

আলিপুরদুয়ার থেকে বক্সার আগের গ্রাম সদরবাজারের দূরত্ব কম নয়। ঘণ্টা দুয়েকের রাস্তা। সেখান থেকে বেশ খানিকটা পথ পাড়ি দিয়ে পানিঝোরা কটেজ। তাকিয়ে দেখলাম সত্যিই প্রতিবন্ধী মানুষটা পথশ্রমে ক্লান্ত। কর্তব্যে গাফিলতি করেছে বলে লোকটা বেশ ভয়ে ভয়ে আছে। হাত জড়ো করে করুণ মুখ করে বলল, হামার নামে রাপাট করবেন না সাহাব। নোকরি চলে যাবে। বালবাচ্চা লিয়ে না খেয়ে মরব।

মনে মনে ভাবছি, এই অভিশপ্ত কটেজ ছেড়ে বেরোতে পারলে বাঁচি। তাছাড়া জানিই তো না কে মালিক, কার কাছেই বা কেয়ারটেকারের কর্তব্যে গাফিলতির জন্য অভিযোগ জানাব। মুখে বললাম, ঠিক আছে। রিপোর্ট করব না।

উৎপল বলল, সনাতনের মুখেই আদ্যোপান্ত শুনলাম গোটা ঘটনাটা। আরকিওলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে দুই অফিসার বক্সা ফোর্ট চত্বরে এসেছিল সার্ভে-টার্ভে করতে। বাগডোগরা এয়ারপোর্টে রিকুং গিয়েছিল তাদের ড্রপ করতে। এদিক দিয়ে ফেরার সময় আমাদের ফোনে বহুবার ট্রাই করেছে। আমরা পরিষেবা সীমার বাইরে। তাই লাইন পায়নি। আমাদের খোঁজে রিকুং পানিঝোরা কটেজের দিকেই আসছিল। পথে দৈবাৎ সনাতনের সঙ্গে দেখা। রিকুংয়ের মুখে আমাদের কথা শুনেই সনাতন ছুটতে ছুটতে এসেছে।

আমি জিজ্ঞাসুমুখে একবার উৎপল তারপর সনাতনকে দেখে বললাম, রিকুং কোথায়?

সনাতন বলল, টুটা হুয়া পুল কি উস তরফ আছে সাহাব। আপনাদেরই ইন্তেজার করছে।

কথাটা আগে ভাবিনি। এবার মাথায় এল। উৎপলকে বললাম, এই কটেজ তো স্ট্র্যান্ডেড হয়ে আছে। তাহলে সনাতন এল কী করে?

উৎপল সনাতনের দিকে ফিরে বলল, তুমি এলে কী করে? সাঁতরে ঝোরাটা পার হয়ে এসেছ?

সনাতন বলল, নেহি সাহাব, আমার পা খারাব আছে। সান্তার-উন্তার জানি না। কটেজের ওপাশ দিয়ে এসেছি। আদমিলোগ ওদিক দিয়ে আনাযানা করতে পারে। লেকিন গাড়ি নেহি আ সাকেগা।

উৎপল ভুরু নাচিয়ে মজা করে বলল, সনাতন আসার সময় চাল-ডাল-তেল-মশলার সঙ্গে বুনো মুরগির মাংসও কিনে এনেছে। কী করবি অতীন? আজকের রাতটা থেকে যাবি? এই ক'দিন তো অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে কেটেছে। আজ একটু জমিয়ে ফিস্টি করা যাক, কী বলিস !

মা, স্নিগ্ধা, রুবাই, পাপনের মুখগুলো মনে করছিলাম। ওরা কেমন আছে কে জানে! বাড়ি ফেরার জন্য আমার তর সইছিল না। অসহিষ্ণু স্বরে আমি বললাম, তুই আর সনাতন মিলে এখানে জমিয়ে পিকনিক কর। আমাকে লাখ টাকা দিলেও এই কটেজে আর এক মুহূর্ত আমি থাকব না। এই আমার সাফ কথা।

উৎপল বলল, ধুস, আমি তো মজা করছিলাম। তুই কি ঠাট্টাও বুঝিস না। তুই ঠিক বলেছিস রে অতীন, জায়গাটা সত্যিই অভিশপ্ত। নাহ, এখানে আর থাকা চলে না। আমি আমার লাগেজ গুছিয়ে নিচ্ছি। তুইও রেডি হয়ে নে চটপট।

ব্যাকপ্যাক কাঁধে বেরিয়ে এসেছি। কটেজের পেছনদিকে গভীর খাদ। ওপাশে নিস্তব্ধ নির্জন পাহাড়। সাদা কুয়াশার চাদরের ওদিকে ঝোরার ওপাশে রিকুংয়ের এসইউভি গাড়ির আদলটা দেখা যাচ্ছে। মোবাইল ফোন বের করে তাকালাম স্ক্রিনের দিকে। নাহ, নেটওয়ার্ক নেই। বিরক্তির আঁকিবুকি মুখে ফুটল আমার। উৎপলকে বললাম, দ্যাখ তো তোর ফোন থেকে রিকুংকে ধরা যায় কি না?

উৎপল ফোন বার করে হতাশ গলায় বলল, আমার ফোনেও টাওয়ার নেই। ফোন বার করতে গিয়ে উৎপলের পকেট থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা প্লাস্টিকের পাউচ। চিনতে পারলাম সেটা। বক্সা দুর্গ থেকে গঙ্গাচরণের স্মৃতিজড়ানো খানিকটা মাটি নিয়ে এসেছিল পুণ্যস্মৃতি হিসেবে। একটা ছোট্ট প্লাস্টিকের পাউচে রেখেছিল সেই মাটি।

প্লাস্টিকটা একবার কপালে ঠেকাল উৎপল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বুঝলি অতীন, বাড়ি ফিরে এই পবিত্র মাটি বাবার হাতে পৌঁছে দিতে পারলে একটা কাজের কাজ করা হবে।

আমি বললাম, ঠিকই বলেছিস তুই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বক্সা দুর্গ এক অবিস্মরণীয় নাম। স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বাংলার বহু বিপ্লবীকে এখানে বন্দি করে রেখেছিল ব্রিটিশরা। মহারাজা ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, বীরেশ চ্যাটার্জি, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, জ্ঞান মজুমদার, যতীন রায়ের মতো অগ্নিযুগের সন্তানেরা বন্দি ছিলেন এখানে। তাদের সঙ্গে এখানে অন্তরীণ ছিলেন তোর পূর্বপুরুষ গঙ্গাচরণ চক্রবর্তী আর কৃষ্ণ চক্রবর্তী।

উৎপল সায় দিয়ে বলল, 'মেঘের কোলে জেলখানা' কবির এই উপমাটা সার্থক! সমতল থেকে উচ্চতা ২৮৪৪ ফুট। প্রকৃতির খেয়ালে প্রায় সময়ই মেঘ ভিড় করে থাকে। সেদিন আমরা যখন গিয়েছিলাম, তখনও মেঘ পেয়েছি। জানিস তো অতীন, ১৮৬৫ সালে ইংরেজদের হাতে আসার আগে এই দুর্গ ছিল ভুটানরাজের দখলে। তখন তার নাম ছিল পাশাখা জং। ইংরেজরা নতুন নাম দিয়েছিল বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি ব্যারাক। আরও পরে নাম বদলে হয় বক্সাদুয়ার দুর্গ, সংক্ষেপে বক্সা দুর্গ। সেখানকার পবিত্র মাটি সঙ্গে রাখলেও পুণ্য।

ক্রাচ নিয়ে পা টেনে টেনে হাঁটছে সনাতন। কুয়াশার পর্দায় মাঝেমধ্যে আবছা হয়ে যাচ্ছে সনাতনের ধূসর আলোয়ান। সনাতনের পেছন পেছন উৎপল। তার পেছনে আমি। আসার সময় জলের বোতলটা আনতে ভুলে গেছি। জলতেষ্টা পাচ্ছে অনেকক্ষণ থেকে। এদিক ওদিক মুখ ঘুরিয়ে আবার সামনে তাকাতেই একটা ঝাঁকি খেলাম। তিনজন কোথায়, আমরা তো চারজন হাঁটছি। উৎপলের পাশাপাশি হাঁটছে খাকি হাফপ্যান্ট আর ডোরাকাটা জামা পরা ছেলেটা। এদিকে উৎপলের হাবভাব স্বাভাবিক। তার মানে সে তার পাশের ছেলেটাকে দেখতেই পায়নি!

কী করব এখন? উৎপলকে ডেকে সতর্ক করে দেব? চিৎকার করব? দৌড়ে পালাব? কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি কি তবে ভুল দেখছি? ঘাবড়ে গিয়ে চশমাটা খুলে কাচটা মুছে তাকালাম। উঁহু, আমরা তো তিনজন। আমি, উৎপল আর সনাতন। মাথাটা গুলিয়ে গেল। এখানে আসার পর থেকেই চোখটা গন্ডগোল করছে। বাড়ি ফিরে অবশ্যই ডাক্তার দেখাতে হবে।

আমরা দ্রুত পায়ে হাঁটছিলাম। এদিকটায় হাঁটুসমান উচ্চতার ঝোপঝাড় আছে। তার ভেতর থেকে কেমন অদ্ভুত আওয়াজ ভেসে আসছিল। ওদিকটায় গাছগাছালি। পাহাড়ের আড়ালে বলে চাঁদের আলো পড়েনি এখানে। ফলে জায়গাটা কেমন অন্ধকারে থম মেরে আছে। হঠাৎ 'গাঙ্গাচারাণ' বলে কানের কাছে যেন হিসহিস করে উঠল কেউ!

মনের ভুল ভেবে হাঁটতে যেতেই আবার থমকে গেলাম। এবার স্পষ্ট শুনলাম, 'গাঙ্গাচারান' আর 'খ্রিসনা' নামের দুজনের উদ্দেশে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে শাসানির ভঙ্গিতে কীসব বলছে এক মহিলা। মদ্যপের মতো জড়ানো গলা। আপাদমস্তক চমকে তাকালাম। কেউ কোথাও নেই।

সনাতন আর উৎপল স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাঁটছে। ওরা কি কিছুই শুনতে পাচ্ছে না?

ভাবছিলাম উৎপলকে ডাকব। আর ঠিক তখনই কটেজের দিক থেকে সপাং সপাং শব্দ ভেসে এল। কেউ কি চাবুক মারছে কাউকে? পুরুষকণ্ঠের হিংস্র পৈশাচিক চিৎকার ভেসে এল আমার কানে। কেউ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে কটেজের ভেতর থেকে। খ্যালখ্যাল করে ডাইনির মতো এক মহিলাকণ্ঠের হাসির শব্দ শুনতে পেলাম। একটা কুকুর প্রচণ্ড জোরে ডেকে উঠল। আর তখনই একটা অচেনা পাখি ট্যাঁ ট্যাঁ করে চেঁচিয়ে আরও চমকে দিল।

পানিঝোরা কটেজের সামনে দিয়েই চলাচল করেছি, এদিকটা লক্ষ করিনি আগে। এদিকে ঝোরাটা তুলনায় অনেকটা সরু। বুনো গাছগাছালি ভিড় করে আছে। লতাগুলা আর অর্কিড চোখে পড়ছে। মোটা মোটা গাছের গায়ে জড়িয়ে আছে দড়ির মতো লতা। হাত দিয়ে একটা লতা ছিঁড়ে নিল সনাতন। মুখ ফিরিয়ে বলল, পানি পিনা হ্যায়, সাহাব?

বেশ অবাক হলাম। আমার যে জলতেষ্টা পেয়েছে, সেটা কী করে জানল সনাতন? আমার শুকিয়ে যাওয়া মুখচোখ দেখেই কি টের পেয়েছে?

সনাতন যা বলল তার মর্মার্থ হল, এই লতানো গাছের নাম পানিলতা। কেউ কেউ বলে পানিলহরা। বক্সার পাহাড়ি জঙ্গলেই শুধু এই গাছ পাওয়া যায়। সনাতন মিটারখানেক লম্বা একটা লতা ছিঁড়ে এগিয়ে দিল আমার দিকে। ছেঁড়া অংশটা দিয়ে স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো জল পড়ছে টুপটুপ করে।

উৎপল চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হলেও স্বভাবে নেচারলাভার। পরিবেশ বিষয়ের ইংরেজি ম্যাগাজিন-ট্যাগাজিন ঘাঁটে। আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে উঠল, মনে পড়েছে রে অতীন, এর নাম ভাইটিস রেপান্ডা!

বক্সার জঙ্গলের ইউনিক গাছ এটা। ইংরেজদের তাড়া খেয়ে এই জঙ্গলে লুকিয়ে থাকার সময় কত অজস্র স্বাধীনতা সংগ্রামী যে এই পানিলতার জল খেয়ে তৃষ্ণা মিটিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই।

সনাতন অবশ্য উৎপলের কথার মাথামুন্ডু বুঝল না। সে বিনীত ভঙ্গিতে আড়ষ্ট গলায় বলল, পিনে কা পানি সে ভি বেহতর হ্যায় ইয়ে। পি লিজিয়ে সাহাব।

সনাতন নিজেই এক মিটার লম্বা একটা লতা ছিঁড়ে এনে দিল। তার থেকে প্রায় এক গ্লাস জল পাওয়া গেল। চমৎকার স্বাদ।

একটা ফাঁপা গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে। বিরাট একটা গাছ ভেঙে পড়ে আছে ঝোরার ওপর। গিয়ে পৌঁছেছে ওপাশের ডাঙায়। গাছের কাণ্ডে জড়িয়ে আছে শুকিয়ে যাওয়া পানিলতা। একটার সঙ্গে আর একটা জড়াজড়ি করে পাকানো মোটা মোটা দড়ি। দোলনার দড়ির মতো নেমে এসেছে মাটিতে। কয়েকটা লতা ছিঁড়ে দড়ি বানিয়ে নেওয়া হল। দড়ির এক প্রান্ত কোমরে বেঁধে নিলাম। আগুপিছু করে এগোচ্ছি। পাহাড়ি ঝোরার জল যে এমন হিমশীতল হতে পারে ধারণাই ছিল না। প্যান্ট গুটিয়ে নিয়েছি হাঁটুর ওপর। জলে মারাত্মক স্রোত। দশ মিটার পাড়ি দিতে দশ মিনিট লেগে গেল।

উৎপল মুখ ফিরিয়ে বলল, সংকোশ, জয়ন্তি, বালার মতো সাতটা নদী বক্সা জঙ্গলের বুক চিরে চলে গেছে। এই পাহাড়ের মাথায় উঠলে নদীগুলোকে পরিষ্কার দেখা যায়। জানিস তো অতীন, বক্সা জঙ্গলে অর্কিডের যেমন ভ্যারাইটি তেমনি এখানকার রংবাহারি প্রজাপতি আর পাখি। ক্রিস্টেড কিংফিশার, ইন্ডিয়ান রোলার, সারপেন্ট ইগল, হর্নবিল, বিউটিফুল নাটাচ, গ্রিন কোচোয়া, হিমালয়ান গ্রিফন... কত রকমের যে বিরল প্রজাতির পাখি আছে এখানে তার ইয়ত্তা নেই। তবে এই জঙ্গলে বক্সা টাইগার রিজার্ভের হিংস্র লেপার্ডও আছে। এই যে আমরা হাঁটছি জঙ্গলের মধ্যে, গুঁড়ি মেরে তাদের কেউ কেউ হয়তো আমাদের ওপর লক্ষ্য রাখছে।

লেপার্ডের কথায় আমার বুকটা ফের কেঁপে উঠল। দ্রুত পায়ে ঝোরার ওপর দিয়ে হেঁটে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাঙা পুলের কাছে এলাম। অবাক কাণ্ড! রিকুংয়ের গাড়ির কোনও চিহ্ন নেই। সনাতন চিন্তিত মুখ করে বলল, তাজ্জব কি বাত! গয়া কাঁহা উও ড্রাইভার?

আমি অধৈর্য স্বরে বললাম, রিকুংয়ের কি একটা আক্কেল নেই? গাড়ি নিয়ে কোথায় চলে গেল? এখানে মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক নেই, ওকে তো ফোনেও ধরতে পারছি না।

শালসেগুনের জঙ্গল। কী একটা পোকা ডাকছে কটকট শব্দ করে। উৎপল সন্ত্রস্ত গলায় বলল, এসব দিকে জঙ্গল থেকে মাঝেমধ্যেই হাতি বেরিয়ে পড়ে।

কথাটা সনাতন শুনেছে। দাঁত বের করে অভয় দিল আমাদের। হাসিমুখে বলল, বেফিকর রহিয়ে সাহাব। ম্যায় হু না!

আমি আর উৎপল রিকুংয়ের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকলাম। কোনও সাড়া নেই। আবার ডাকলাম। জঙ্গলের ভেতর থেকে কুকুরের ভৌক-ভৌক ডাকের শব্দ শুনতে পেলাম। তীক্ষ্ন একটা শিসের শব্দ কানে এল। তারপর আবার কুকুরের ডাক।।

উৎপল এমন করে শিস বাজায়। কিন্তু উৎপল তো আমার পাশে। তাহলে এই শিসের শব্দ কোথা থেকে আসছে? কে বাজাচ্ছে শিস? মনটা খুঁতখুঁত করছিল। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছিল, আমরা আবার কোনও ফাঁদে পড়তে চলেছি।

আমি রিকুংয়ের খোঁজে জঙ্গলের দিকে আর যেতে চাইছিলাম না। কিন্তু এই অভিশপ্ত জায়গা থেকে ফিরতে গেলে এটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে। জঙ্গলের মধ্যে চড়াই পথ ধরে উঠছি। সনাতন হাঁটছে আগে আগে। আমরা ওর পেছন পেছন। এবড়োখেবড়ো পথ দিয়েও সাবলীলভাবে উঠছে সনাতন। ক্রাচ দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে চলার পথের ঝোপঝাড়। মুখ ফিরিয়ে বলল, চলিয়ে সাহাব। দেখতে হ্যায় অর থোড়া উপর যাকে। উও ড্রাইভার ইধারই কঁহি হ্যায়।

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। তখনই আবার একটা অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখলাম। খাকি হাফপ্যান্ট আর ডোরাকাটা জামা পরা ছেলেটা কোত্থেকে যেন মাটি ফুঁড়ে চলে এসেছে। উৎপলের পাশ দিয়ে হাঁটছিল। এবার সে যেন উৎপলের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। চশমা খুলে চোখ রগড়ে নিলাম। আমার হতভম্ব দশাটা কাটছে না!

এদিকে ঘণ্টা নাড়ার মতো আওয়াজ হচ্ছে। এই জঙ্গলের মধ্যে আশেপাশে কি মন্দির আছে কোথাও? সেখান থেকেই কি আওয়াজটা আসছে? পাশ থেকে উৎপল অচেনা গলায় বলল, কৃষ্ণ, তুই কি ভুলে গেছিস? এটা কাঠঝিঁঝির আওয়াজ। ওরা পেটের মধ্যেকার মাংসপিণ্ডে আঘাত করে সঙ্গীকে ডেকে নেয়! বক্সা জঙ্গলেই ওদের দেখা যায়।

আমি কৃষ্ণ! চমকে উৎপলের মুখের দিকে তাকালাম। উৎপল হাসল। লক্ষ করছি উৎপলের মুখচোখ বদলে বদলে যাচ্ছে।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছি আমরা। শাল-সেগুন-অমলতাস- চিকরাশির সোঁদা গন্ধ নাকে আসছে। আমাদের পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে ডেকে উঠছে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ঘুমিয়ে থাকা পাখি। একটা ঝোপের মধ্যে আমার চোখ আটকে গেল। একটা ইয়েলো স্পটেড ব্ল্যাক স্পাইডার জাল বুনে চলছে অসীম ধৈর্যে।

হাঁটতে হাঁটতেই থমকে দাঁড়ালাম। মনে হল আমি এই জঙ্গলে আগেও এসেছি। রাতেও থেকেছি গাছের ডালে বাঁধা মাচায় বসে। কী এক আশ্চর্য ম্যাজিকে পূর্বজন্মের স্মৃতি যেন ফিরে এসেছে আমার কাছে। ভেতর থেকে কেউ যেন চুপচুপ করে আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেল, ওই যে খাটা লাইন, ওখানে লপচাখ, ওমছলুম। ওখানে বসে ডুকপা হাট। আর ওই পথ গেছে রুপাং ভ্যালি হয়ে পাম-সোলার দিকে। অথচ আশ্চর্য এই যে, এই জায়গাগুলোর নাম আমি আগে কখনও শুনিইনি!

জঙ্গলের গভীর অঞ্চলে এসে পড়েছি। এককোণে মাচা বাঁধা। উৎপল আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। চাপা স্বরে বলল, আমরা এমন মাচাতেই তো লুকিয়ে থাকতাম। একবার স্বাধীন আর পূর্ণ ধরা পড়ে গিয়েছিল লিউনিলের হাতে। গুলি করে মেরে জঙ্গলের মধ্যেই ওদের কবর দিয়ে দিয়েছিল। মনে পড়ছে তোর, কৃষ্ণ?

জঙ্গলের মধ্যে থেকে ভৌক-ভৌক করে কুকুরের গর্জনের শব্দ কানে এল। বুকের রক্ত চলকে উঠল সেই শব্দে। জঙ্গলের মধ্যে গোল একটা জলাধার। পাশে সাদা নুনপাথর। জঙ্গলের প্রাণীদের নুন আর জল খাবার জায়গা এটা। একটা চাপা আলো অদ্ভুত এক রহস্যের জন্ম দিয়েছে। সেখানে যে দৃশ্য দেখলাম, তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

বড় একটা গাছের ডালে ঝোলানো হয়েছে মোটা দড়ি। খাকি হাফপ্যান্ট আর ডোরাকাটা বেঢপ ঢোলা জামা পরা একজনের গলায় দড়ি পরিয়ে ঝোলানো হয়েছে সেই গাছে। একটার পর একটা পাথর স্তূপ করে তোলা। সেই পাথরে ঠেকে আছে লোকটার পা। কোনও কারণে একটা পাথর সরিয়ে দিলেই ঝুলে পড়বে লোকটার দেহ। কালো কুচকুচে ভয়ানক চেহারার একটা কুকুর পাক খাচ্ছে পাথরগুলোকে ঘিরে। মাঝেমধ্যে মাথা তুলে হিংস্র চোখে দেখছে ফাঁসির দড়ি পরানো লোকটাকে।

উৎপল আঁতকে উঠে বলল, ওটা তো টেডি!

একদল সাদা সাহেব গোল হয়ে ঘিরে আছে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া মানুষটাকে। সাহেবদের সমবেত উল্লাস আছড়ে পড়ল আমাদের কানে।

উৎপল বলল, চিনতে পারছিস কৃষ্ণ? ওই দ্যাখ, হান্টার নিয়ে যে লোকটা ওটা লিউনিল। বন্দুক হাতে যার তার নাম রবার্ট। তার পাশে লাল চুলের মেমসাহেবের নাম মার্থা, রবার্টের বউ। রবার্টের থেকেও বেশি নৃশংস। আর ওই দ্যাখ শয়তানের বাচ্চা কোট্টামকে। আমাদের দেশের লোক হয়েও সাহেবদের যে পা চাটে।

রবার্ট দু'আঙুল মুখের কাছে নিয়ে কান ফাটানো শিস দিল। পর পর দু'বার। হাতের বন্দুকটা এগিয়ে দিল শিকারের পোশাক পরা মার্থার দিকে। ডাইনির মতো খ্যালখ্যাল করে হাসতে হাসতে এক চোখ বুজে নিশানা করছে মার্থা। নেশা করে আছে বোধ হয়। টলছে অল্প অল্প।

হাসিটা থামিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, হাও ডু ইউ ওয়ান্ট টু ডাই, টেজবাহাদুর গুরুং? টু বি হ্যাংগড, টু বি শুট অর টু বি ফেড বাই টেডি? দ্য চয়েস ইজ ইয়োর্স।

আমার মেরুদাঁড়া দিয়ে বরফের স্রোত নেমে গেল যেন। পানিঝোরা কটেজ ছেড়ে বেরোবার সময় এক মেমসাহেবের হিসহিসানি শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। এ তো সেই কণ্ঠস্বর! আমার গলার কাছটা চ্যাটচ্যাট করছিল। তাকিয়ে ছিলাম সামনের দিকে। নাটকের মুক্তমঞ্চের মতো লাগছে জায়গাটাকে। রোমহর্ষক কোনও জ্যান্ত নাটক যেন অভিনীত হচ্ছে আমাদের সামনে।

বনজ্যোৎস্নার ঝাপসা সবুজ আলো এসে পড়েছে ফাঁসির দড়ি পরানো তেজবাহাদুর গুরুংয়ের মুখে। ক্ষতবিক্ষত শরীর। রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে ঠোঁটের কষ বেয়ে। মঙ্গোলয়েড মুখের মানুষটাকে দেখে বুকের সমস্ত রক্ত জমাট বেঁধে গেল। আমার মুখ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে এল আর্তস্বর, কী আশ্চর্য এ তো রিকুং!

রিকুং মুখ হেলিয়ে একদলা থুতু ফেলল। আমার গলা শুনতে পেরেছে নিশ্চয়ই। মুখটা ফেরাল এদিকে। হ্যাঁ দেখে ফেলেছে আমাদের। চিৎকার করে বলল, গঙ্গাদাজু-কৃষ্ণদাজু! ভাগ যাইয়ে, ভাগ যাইয়ে তুরন্ত!

ঘটনার আকস্মিকতায় হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমার আর উৎপলের ঘাড়টা শক্ত করে চেপে ধরল কেউ। মুখ ফেরাতেই চমকে গেলাম। এতক্ষণ বিনীত ভঙ্গিতে জড়োসড়ো হয়ে থাকা সনাতন চৌবের শরীরী ভাষা বদলে গেছে রাতারাতি। বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছি। ঢোক গিললাম একবার। ছ'ফিট লম্বা শক্তপোক্ত চেহারার সনাতন চৌবে শয়তানি হাসি হাসছে। লোকটার ক্রুর চোখের দৃষ্টি দেখে আমার বুকের সমস্ত রক্ত যেন জল হয়ে গেল!



সাগরিকা রায়

একাদশ পর্ব

নৈঃশব্দ্যেরও একটা শব্দ আছে। রি রি রি...! পাখিটা লম্বা ঠোঁট নামিয়ে কিছু একটা দেখছে নীচে। তখনই শাটারের শব্দ হল। রেহান ক্যামেরার ফোকাস পয়েন্ট স্লোলি সরিয়ে নিচ্ছে পাখির ঠোঁটে। ক্লিক। চমকে উঠল হর্ণবিল।

রেহান বার্ড ফটোগ্রাফার। উত্তরবঙ্গে পাখির ছবি তুলতে এসেছে। বক্সাদুয়ারের প্রজাপতির প্রাচুর্য নিয়ে অনেক শুনেছে। কিন্তু তার উত্তরবঙ্গের বন্ধু, বার্ডার, রোদেলা বসু রেহানকে এখানকার পাখির কথাও বলেছিল। রোদেলা বলেছে, সময় বার করতে পারলে ওর সঙ্গে এসে যোগ দেবে।

বিলুপ্তপ্রায় পাখিদের নিয়ে ও কাজ করতে চায়। ছোটবেলায় একবার উত্তরবঙ্গে এসেছিল বাবা-মায়ের সঙ্গে। সেই সময় পাখি দেখেছিল কয়েক রকমের। তখন হাতে ছিল একটা অ্যানালগ ফিল্ম ক্যামেরা। পরে জন্মদিনে বাবা গিফট করে ৬ মেগাপিক্সেল ডিজিটাল কমপ্যাক্ট। ২০১২ সালে হাই এন্ডের একটা ডিএসএলআর ক্যামেরা আর একটা ফিক্সড অ্যাপারচারের টেলি লেন্স হাতে আসে।

এই মুহূর্তে পাখির ছবির দৌলতে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পুরস্কার রেহানের দখলে রয়েছে। কিছু বার্ডারের সঙ্গে পরিচয় এখন গাঢ়। তার মধ্যে রোদেলার নাম একেবারেই প্রথম দিকে। আর একজন আছে। অ্যালান মারফি। টেক্সাসের বাসিন্দা। নর্থ আমেরিকার প্রায় ছ'শো প্রজাতির পাখির ছবি আছে যার দখলে। আবার এডওয়ার্ড চাভি বো-র ছবি দেখে মনে হয় চাভি যেন খানিকটা পরাবাস্তব দুনিয়ার খোঁজ দিচ্ছেন। ক্রোনো-ফটোগ্রাফি। রেহানের মনে হয়, এই পদ্ধতির সাহায্যে মাইব্রিজ প্রমাণ করেছিলেন ঘোড়া দৌড়নোর সময়ে কয়েক মিলি সেকেন্ডের জন্য শূন্যে ভাসে।

রেহানের শখের ব্যাপারটা রোদেলা জানে। রেহানের ইচ্ছে আছে, স্পেনের কাটালুনিয়া অঞ্চলের লা টেরেটা উপত্যকায় ঘূর্ণিঝড়ের মতো করে উড়ে যাওয়া শকুনির ছবি তোলার। আপাতত দূরের শখের বাক্সে তালা দিয়ে কাছের শখের কাছে এসেছে ও। ইচ্ছে ছিল দার্জিলিঙে গিয়ে কিছু পাখির ছবি তুলবে। বক্সায় আসার আগেই এনজেপি থেকে নকশালবাড়িতে গিয়েছিল ও।

বাবা বলেছিল, একবার ঘুরে আসিস। আমার চাকরি জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ দেখাতে পেরেছিলাম এই নকশালবাড়িতেই। প্রতিপত্তি আমাদের বংশে ছিলই। আমাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, বুঝেছিস? দেশকে স্বাধীন করতে কিছু স্বদেশী ডাকাত খেপে উঠেছিল। তাদের জব্দ করেছিলেন। তিনি যে পথ দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, সেটাকে অব্যাহত রাখতে পেরেছি আমি। যাক, জায়গাটা দেখে আসিস। বলতে বলতে রেহানের বাবার চোখে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি চোর-পুলিশ খেলছিল।

রেহান বিষয়টা জানে। ও শুনেছে তুষারকাকার মুখ থেকে। কলকাতায় রেহানের মামাবাড়ি বেহালায়। হরিসভা লেনে। সেখানে মামাবাড়ির খুব কাছাকাছি একটা চায়ের দোকান ছিল তুষারকাকার। কাঁচাপাকা চুল, মুখে রাজ্যের বিষাদ নিয়ে যখন চায়ের গেলাসে ঘটর ঘটর করে চিনি গুলত, তখন মনে হত চা নিশ্চয় তেতো হয়েছে। কিন্তু কখনওই কাউকে সে বিষয়ে অভিযোগ জানাতে দেখেনি রেহান।

সেই তুষারকাকা একদিন রাস্তার মোড়ের দিকে হেঁটে চলে যাওয়া এক বৃদ্ধাকে দেখিয়ে বলেছিল, কে ওটা? জানো? ওর সর্বনাশ কে করেছে জানো? পুলিশ। ওর ছেলে অশোককে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। কোনও খোঁজই পাওয়া যায়নি অশোকের। বড় ভালো ছেলে ছিল। মানুষের উপকারে এগিয়ে যেত। তখন নকশাল আন্দোলন চলছে। আন্দোলনকে দমিয়ে দিতে পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ধরে নিয়ে যাচ্ছে সব যুবকদের। সারারাত পুলিশের বুটের আওয়াজ পেতাম। আর শুনলেই লুকিয়ে পড়ত সবাই। ভয়! খুব ভয়ের রাতগুলো দেখেছি আমি...! সেদিন ছিল দুপুরবেলা। আমার রেবাকাকিমা কলতলায় কাপড়ের গামলা নিয়ে বসেছে।

থুপিয়ে কাপড় কাচছে। ঠিক তখন বোম ফাটল। ওরে, কী শব্দ! যেন কানে তালা লেগে গেল। তারপরেই শুনলাম রেবাকাকিমার আর্তনাদ, 'মা গো! মরে গেলাম মা...!'

দেখা গেল, কাকিমার শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আহত হয়েছে কাকিমা। কেউ নেই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কে যাবে? পুলিশের টহল চলছে। যাকে দেখবে তাকেই ধরে নিয়ে যাবে। অশোক এগিয়ে এসে একটা রিকশা জোগাড় করে কাকিমাকে সিটে বসিয়ে নিয়ে গেল। কাকিমা রাস্তাতেই মারা গেলেন। রিকশাওলা তেমনই বলেছিল। আর অশোককে নাকি পুলিশ ধরেছিল। তখন তো তোমার বাবা ছিলেন লোকাল থানার ওসি। তিনি বলতে পারবেন সবটা। ওরা নিয়ে গেল। আর ফিরে আসেনি অশোক। আর তোমাদের পাশের বাড়ির অমূল্যর কথা তো জানোই। জিগ্যেস কোরো তোমার বাবাকে। তিনি ভালো জানেন।

আগ্রহী রেহান জিগ্যেস করেছিল। বাবা উদ্ভাসিত মুখে বলেছিলেন, অমূল্য জলপাইগুড়ির একটা মেসে থাকত। অমূল্য ছিল নকশালপন্থী। ওই তো, রাস্তার মোড়ের পরে যে গলিটা, সেখানে ওদের বাড়ি। চিনি সবাইকে। তো আমি তখন জলপাইগুড়িতে আছি দায়িত্ব নিয়ে। তখন শুনলাম জলপাইগুড়ির সেই মেসবাড়িটা রেইড হবে। মেসবাড়ির নাম ভিয়েতনাম যুদ্ধে ইউস করা একটি শত্রুবিধ্বংসী জাহাজ 'ইপিকাকু আনহা'-র নামে। সেখানে অমূল্য আছে আমি জানি। কিন্তু আমার চাকরির একটা দায়িত্ব আছে। আমি স্বজনপোষণ করতে পারি না। তো অমূল্যকে ধরিয়ে দিলাম আরও কয়েকজনের সঙ্গে। ডিউটি আগে। এটাই শিখে রেখো।

নকশাল আমলেই রেহানের বাবা দীপেন্দ্রনাথের চাকরিতে প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। নকশালবাড়ি শব্দটা রেহানের বাবার বড় প্রিয়, এই কারণেই হয়তো। রেহান জায়গাটা দেখে এসেছে এখানে আসার আগে। জাস্ট বুড়ি ছুঁয়ে আসা যাকে বলে।

বাবার মুখেই রেহান শিলিগুড়ি মহকুমার ছোট জায়গা নকশালবাড়ি সম্পর্কে শুনেছে। নকশালবাড়ি থেকে একটি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা হয়। কৃষকদের অধিকারের দাবিতে নকশালবাড়ি গর্জে উঠেছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল, জোতদার বা ভূস্বামী! আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল বহু বিত্তবান ঘরের সন্তান। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই আন্দোলনে। রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছিল চরম বিশৃঙ্খলা হিংসা। কলেজের গোপন ঘরে বসে ছাত্ররা নাকি অস্ত্র বানাত।

এই বিদ্রোহকে অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে দমন করা হয়। যার একটি অংশ ছিলেন রেহানের বাবা। সে নিয়ে রেহানেরও গর্ব আছে। আন্দোলনটা ভালো না মন্দ, ওসব নিয়ে ভাবেই না রেহান। যেমন ভাবেনি ওর বাবা, ওর পূর্বপুরুষ। তাঁরা সব যুগেই শাসকের অধীনস্থ ছিলেন। শাসককে খুশি করে নিজের আখের গুছিয়েছেন। তাঁরা নিজেদের বেইমান নয়, ইমানদার ভাবেন।

রেহান দূরের ঝোরার দিকে তাকাল। পেছনে সবুজের ভ্যারাইটি নিয়ে এক স্টিল ছবির মতো অরণ্য, সামনে উঁচু টিলার ওপরে ছোট্ট কটেজ। আচ্ছা, ওটাই তাহলে পানিঝোরা কটেজ! কী একটা যেন মনে পড়ে পড়ে করেও পড়ছিল না।

রেহান ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে নিল। আজ সারাদিন এই এলাকায় থাকার ইচ্ছে ওর। বিকেলের দিকে বেরিয়ে যাবে। দু-দিন সান্তালবাড়ি, জয়ন্তীতে থেকে তারপর সোজা কলকাতার সল্টলেক সিটি সেক্টর ওয়ানের থ্রি-বিএইচকে ফ্ল্যাটে। লকডাউন হালকা হয়ে যাওয়ার পরে ঘরে বসে থাকা যায় না বলেই বেরিয়ে পড়েছে ও। তো, কথা হল, ড্রাইভার ঘুমিয়ে নিক। রেহান ছবি তুলবে। ওকে ডিস্টার্ব না করলেই ভালো।

সামনেই একটা সাঁকো। পুরোনো হয়ে যাওয়া সাঁকোটা যেন রেহানেরই জন্য অপেক্ষা করে আছে। কেউ আসে না এখানে? চারপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না রেহান। একটু শীত শীত করছে। অথচ ওয়েদার ভালো। শিশুর নরম হাসির মতো রোদ গায়ের ওপর হালকা টাচ করে যাচ্ছে।

সাঁকোর ওপরে পা রাখতেই সামান্য দুলে উঠেছে সাঁকোটা। নিজেকে সামলে নিতে নিতেই লোকটাকে দেখল রেহান। জঙ্গল ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে লোকটা। সাঁকোর অন্য পাড়ে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষে রেহানের দিকে তাকিয়ে আছে। হুম লোকটা এখানকারই ভূমিপুত্র। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ একজন। রাগ করেছে নাকি রেহানকে দেখে? রেহান থমকে দাঁড়াতেই লোকটা এগিয়ে এল, 'তোহরে হঁিহা কা করতা? তোহরি চইল যাওয়া। হঁিহা যো কোই আওহে, হোয়েল উকে মাটিমে যাই খোয়েল। তোহরে ভাগা। নখখে, নখখে।'

মনে হচ্ছে লোকটা এখান থেকে চলে যেতে বলছে রেহানকে! এখানে যে আসে, সে মাটিমে যাই খোয়েল! মানে মৃত্যুর কথা বলছে কি? এখানে এলে মরতেই হবে?

আপ হিন্দিমে বোল সকতে?

এ মেরা বোলি হ্যায়। সাদরি। তুম চলে যাও। মরনে কে লিয়ে কিঁউ আয়ে?

লোকটি ইশারায় কটেজের দিকটা দেখাল, বহোত পুরানা বাংলা। মত রুকো। প্রেতাত্মা আতে হ্যায়।

বলতে বলতে লোকটা ব্যাক করে ঝোরার দিকে চলে যাচ্ছে। খানিক গিয়েই ঝট করে পিছন ফিরে তাকাল। অদ্ভুত হেসে বলল, তোহরে ডর নখখে? বলেই সোজা হেঁটে আসতে শুরু করল রেহানের দিকে। ও কি আক্রমণ করবে নাকি? রেহান অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইল। এখন কী করবে রেহান? লোকটা কি পাগল? বড় বড় পদক্ষেপে আসছে।

না। এল না। রেহান থতমত খেয়ে দেখল, দূরে লোকটার অপসৃয়মান শরীরটা জঙ্গলের দিকে চলে যাচ্ছে। তাহলে এই যে এগিয়ে আসছিল দেখল রেহান, সেটা কি হ্যালুসিনেশন? হঠাৎ করে সেটাই বা দেখতে গেল কেন রেহান? লোকটা পিছন ফিরে তাকিয়ে কথা বলেছে তো! নাকি সবটা মায়া?

একটা ঘোরের ভেতরে ঢুকে যাওয়া রেহানের মাথা ঝিমঝিম করছে। এই ঝিমঝিমে স্তব্ধ পরিবেশ ওকে অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছে। এখানে কেউ আসে না কেন? একটা কুকুর বেড়াল পর্যন্ত নেই। আচ্ছা, কুকুর বেড়াল এই জঙ্গলের মধ্যে কেন থাকবে? বুনো জানোয়ার আছে নিশ্চয়ই। সেটাতেই বরং ভয়। রেহান একা! ওর হাতে অস্ত্র নেই। হুম ওই কটেজের দিকে যাবে একবার? কেউ থাকতে পারে। নিদেনপক্ষে কেয়ারটেকার থাকবেই। এলই যখন, তখন একটু ঘুরে দেখে এলেই হয়।

আসলে রেহান বুঝতে পারছে, কটেজটা ওকে চুম্বকের মতো টানছে। জানালা-দরজা বন্ধ কটেজটা নিঝুমপুরী হয়ে রয়েছে! কেবলই মনে হয় একবার উঁকি দিয়ে আসি। রেহান ভাবল, ড্রাইভারকে ডাকবে। পরক্ষণেই মনে হল, ঘুরে এসে গাড়িতে উঠে পড়বে। এখানে কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে ওর। সত্যি করে বলতে গেলে, রেহানের মনে হচ্ছে, ওকে কেউ যেন লক্ষ করছে। অথচ কেউ কোথাও নেই। কে ওকে লক্ষ করবে?

মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে সাবধানে অবজার্ভ করল রেহান। এমন জায়গায় আসাটা উচিত হয়নি। কী যেন একটা অস্বস্তি খিকখিক হাসি হেসে হেসে ওর চারপাশে ওড়াওড়ি করছিল।

একটা ঘটনা পানিঝোরা নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সেটা, ঠিকঠাক মনে পড়ছে না। রেহান জঙ্গলের দিকে তাকাল। জঙ্গল ওর থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে দেখছে। এমন নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে, যেন যে-কোনও মুহূর্তে ম্যাকবেথের বার্নামের বনের মতো এগিয়ে আসবে ওর দিকে। শিরশির করে উঠল শরীর। কেমন শিনশিনে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। বৃষ্টি আসবে কি? সাঁকোর ওপাড়ে ছিল যখন, তখন যে পরিবেশে ছিল, সাঁকো পেরিয়ে এই পাড়ে আসতেই পরিবেশ পালটে গিয়েছে। যেন মৃতের জগতে ঢুকে পড়েছে রেহান। বার্ড ফটোগ্রাফার চাভি বো-র ছবি দেখে যেমন কখনও পরাবাস্তব জগতের কথা মনে হয়, ঠিক তেমন।

রোদের রঙ পালটে গেছে। প্রায় সিপিয়া কালারের রোদ যেন অতীতে নিয়ে এসেছে রেহানকে। রেহানের মনে হল, ডাকলেও ড্রাইভার শুনতে পাবে না ওর ডাক। রেহান এখন অন্য জগতে ঢুকে পড়েছে। এখান থেকে ডাকলে সাঁকোর ওপাড়ের কেউ শুনতে পাবে না। ওদিকটা কুয়াশাচ্ছন্ন। যেন পৃথিবীর ওদিকটা এখনও

জন্মায়নি। তাহলে ড্রাইভার কোথায় আছে এই মুহূর্তে? পানিঝোরার অস্বাভাবিক ব্যাপারটা সম্পর্কে ও জানে?

রেহান যখন সাঁকোর দিকে আসছে, তখন ড্রাইভার ওকে পিছন থেকে বলেছিল, 'বি কেয়ারফুল স্যর। ন ডরাউ। কে হুঞ্ঙ, কসেইলাই থাহা ছইনো।'

তখন কানে নেয়নি। কিন্তু পরের সেন্টেন্সের মধ্যে বাদুড়ের ডানার ঝাপটের মতো ভয় লুকিয়ে ছিল কে হুঞ্ঙ, কসেলাই থাহা ছইনো। বাক্যের অর্থ জিগ্যেস করাতে ড্রাইভার থমকে গিয়ে বলেছিল, কেয়া হোগা, কই না জানে!

কেন বলেছিল? অন্যমনস্ক রেহানের মনে হল, এই মুহূর্তে কিছু একটা ঘটছে। কী? সিক্সথ সেন্স কখনও কখনও রেস্টলেস হয়ে ওঠে। যেমন রেহানের হয়েছে এখন। কী হচ্ছে ওর আশেপাশে? আনকম্ফর্টেবল ফিল হচ্ছে। সাবধানে চোখ সরাতে সরাতে পায়ের খানিকটা দূরের জমির দিকে নজর পড়ল রেহানের। সঙ্গে সঙ্গে অনড় হয়ে গেল রেহান।

একটা ঢিবি রেহানের থেকে খানিক দূরে অল্প নড়ে উঠল! রেহান বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখল, ঢিবিটা মাথা তুলছে। অল্প অল্প নড়ে উঠতে উঠতে জড় অবস্থা থেকে সচল হতে চেষ্টা করছে ঢিবিটা। একসময় রেহান বুঝে ফেলল স্তূপীকৃত মাটি একটি মানুষের চেহারা নিচ্ছে। দলা পাকানো শরীর অল্প তুলে রেহানের দিকে তাকিয়ে আছে। একটি বৃদ্ধ। তার সারা মুখ জুড়ে পৈশাচিক ছায়া লেপটে আছে। রেহানের দিকে তাকিয়ে সে হাসল। বিকৃত হাসি!

রেহান সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে রইল। খুব চেনা, খুব চেনা। এই মুখ কোথায় দেখেছে? বিশেষ করে চোখদুটো! ও দেখেছে এই চোখ। দৃষ্টিটা খুব চেনা। এটা কি মানুষ? নাকি পিশাচ? নাকি নরকের প্রেত? সে নড়বড় নড়বড় করতে করতে ফের গুটিয়ে ঢিবি হয়ে যাচ্ছে। রেহান এবারে ভয়টাকে লুকিয়ে রাখতে পারল না।

কোনদিকে যাবে বুঝতে না পেরে, দৌড়তে শুরু করল। সোজা কটেজের দিকে ছুট দিল। লুকিয়ে পড়তে হলে মাথার ওপরে ছাদ চাই! আর কিছু নয়। ঢিবিটার দিকে একবারের জন্য পিছন ফিরে তাকিয়েছিল রেহান। তাকিয়েই নিজের হার্টবিট শুনতে পেল। ঢিবিটা গড়াতে গড়াতে কটেজের দিকে এগিয়ে আসছে।

পা তুলে পিছনের দিকে সরে যেতে পারছিল না রেহান। ঢিবিটা মাথা তুলে ওকে দেখার চেষ্টা করছে। রেহান কটেজের দরজার দিকে তাকাল। ওখানে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতে পারলেই!

কিন্তু কটেজের দরজা তো বন্ধ! কী করে ঢুকবে রেহান? ওদিকে ঢিবিটা লেথরে লেথরে আসছে। এখনই ধরে ফেলবে। তাকিয়েই চমকে উঠেছে রেহান। আরে, কোথায় ঢিবিটা? নাহ, কিচ্ছু নেই কোথাও! হ্যাঁ, ঢিবিটা আছে, ওই দূরে। একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। এগিয়ে তো আসেনি। কী হল রেহানের? উল্টোপাল্টা দেখছে কেন? তখন ওই লোকটিকে দেখল ওর দিকে এগিয়ে আসতে। পরে দেখা গেল, একদম ভুল দেখেছে। ওকি হ্যালুসিনেশনে ভুগছে? নাকি ওকে নিয়ে কেউ বা পুরো পরিবেশটাই খেলছে?

লম্বা লম্বা পায়ে ছুটতে ছুটতে যখন কটেজের কাছাকাছি চলে এসেছে, তখনই রেহানের মনে পড়ে গেল। প্রায় বছর দুই আগে দুজন ভদ্রলোক এখানে বেড়াতে এসে নিখোঁজ হয়ে যান। এটা নিয়ে খুব হইচই হয়েছিল। তাদের ট্রেস পাওয়া যায়নি।

এটা কি অভিশপ্ত বাংলো নাকি? যে আসে, সে-ই নিখোঁজ হয়ে যায়? সে শুনেছে ইংরেজ আমলের এই বাংলোতে কোন এক বিপ্লবীকে ধরে এনে অকথ্য অত্যাচার করা হয়েছিল। সেই সময় নিউজ পেপারে এই বাংলোর অতীত ইতিহাসকে টেনে আনা হয়েছিল। দুজন বিপ্লবী বক্সা ফোর্ট থেকে পালালে একজনকে ধরে এই বাংলোর একটা ঘরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। বলা হয়েছিল, স্বদেশী ডাকাত ধরা পড়েছে। শাসক যা দেখাবে, প্রজাকে সেটাই দেখতে হয়। চিরকালীন নিয়ম। কিন্তু সকলেই কি এই নিয়ম মেনে চলবে? নাকি চলে? চলে না বলেই তাদের গায়ে স্ট্যাম্প খোদাই করা হয়েছিল 'ডাকাত' বলে?

রেহান কটেজের বন্ধ দরজার দিকে তাকাল। অদ্ভুত নীরবতা! স্থির হয়ে শোক পালন করছে যেন কটেজটা।

আস্তে আস্তে কটেজের সিঁড়িতে পা রাখল রেহান। নিষিদ্ধ জগতের মানুষের প্রতি আকর্ষণ থাকে। রেহান একফালি বারান্দায় পা রেখে দরজার দিকে তাকাল। একি? দরজাটা খোলা! এইমাত্রই তো বন্ধ দেখেছে রেহান। ধুস কী হচ্ছে এখানে? দরজাটা অল্প খোলা আছে! ঘরের ভেতরটা ঘন অন্ধকারে ডুবে। খানিকটা অন্ধকার দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে কৌতূহলী বৃদ্ধার মতো উঁকি মেরে রেহানকে দেখছিল।

রেহান সম্মোহিতের মতো দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ভেতরে সাপখোপ থাকতে পারে। নিদেনপক্ষে সেই আত্মা না কী বলে গেল লোকটা? অদ্ভুত কিছু থাকবে, এ আর বেশি কী? এখানে আসার পর থেকেই যা হচ্ছে! কোনওকিছুই আর নিজের কন্ট্রোলে নেই। তবু, ফিরে যাওয়ার কথা ওর মাথায় এল না। তীব্র আকর্ষণ করছে বন্ধ দরজার ভেতরটা। কী আছে ওখানে?

রেহানের হাতের চাপে দরজাটা আস্তে করে খুলে গেল। হালকা শব্দ উঠল ক্যাঁ-চ! উঁকি দিল রেহান। ঘন অন্ধকারে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু কোথায় যেন একটা কিছু হচ্ছে! একটা গোঙানি! মৃত্যু যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠছে কেউ!

রেহান দ্রুত ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল। এই পরিত্যক্ত বাংলোতে নিশ্চিত অসামাজিক কাজ হয়। কাউকে আটকে রাখা হয়েছে কি? ওর সঙ্গে অস্ত্র বলতে কিছুই নেই। তবু, এই গোঙানিকে পিছনে ফেলে পালাবে কী করে? এই ঘরে নয়, পাশের ঘর থেকে গোঙানিটা আসছে। রেহান আস্তে, সাবধানে দরজায় চাপ দিতে ভেজানো দরজা খুলে গেল।

ভেতরে ঘন অন্ধকারের মধ্যে এক জায়গায় সিলিং থেকে নেমে আসা নাটকে ব্যবহৃত স্পট লাইটের মতো অস্বাভাবিক এক আলো-ছায়ার খেলা চলছে। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন ইংরেজ, হাতে উদ্যত রিভলবার। ওপরে কড়িকাঠের সঙ্গে দোল খাচ্ছে একটি অল্পবয়সি ছেলের ঝুলন্ত দেহ। ঘাড় হেলে গিয়েছে ডানদিকে। জিভ বেরিয়ে এসেছে। গোঙানি আর নেই। অল্প হাঁ করা মুখ থেকে সুতোর মতো রক্ত মাখা লালা গড়িয়ে নামছে। আলো-ছায়ার ভেতর থেকে পুরনো ছবির মতো কিছু সিপাই ইংরেজটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কয়েদি মর গ্যয়া সাহেব।'

আর তখনই একটা বিশাল কুকুর বাইরের দিক থেকে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাহেবের ওপর। গর্জে উঠেছে রিভলভার। কুকুরটা রক্তাক্ত শরীর নিয়ে বাইরের দিকে ছুটে গেল। রক্তের ফোঁটা পড়তে লাগল টপ! টপ! টপ!

রেহান স্থবির হয়ে গেল। আলো-ছায়ার তরঙ্গ ঘরের ভেতরে পাক খাচ্ছে ঝুলে থাকা বডিটার মতো। দুটো পা দেখা যাচ্ছে। মাটি থেকে অনেকটা ওপরে ঝুলে আছে পা দুটো। ছেলেটাকে ফাঁসি দিয়েছে! প্রাচীন একটি সময়ের ছবি ওর সামনে অভিনীত হল। নিউজ পেপারে এই ঘটনার কথাই পড়েছিল? বক্সা ফোর্ট থেকে পালিয়ে আসা স্বদেশী ডাকাতকে ধরে ফেলে ইংরেজ শাসকের বাংলোর মধ্যে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল! সেই ঘটনা এখন দেখছে কী করে রেহান? ওকে কেউ খেয়াল করছে না, দেখতেই পাচ্ছে না?

রেহান সম্বিৎ ফিরে পেতেই দেখল ঘরের ভেতরে কেউ কোথাও নেই। এখানে কী অনেক কাল আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল? আচ্ছা, বেড়াতে এসেছিলেন যে দুই ভদ্রলোক, তাদের ড্রাইভার, কেউ আর ফিরে যায়নি কলকাতায় নিজেদের বাড়িতে! কোথায় গেলেন তাঁরা?

রেহানের অস্থির অস্থির লাগছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের রোদ ভরা দিনটার দিকে তাকাল। সব কিছু আশ্চর্যজনকভাবে স্থির হয়ে আছে, যেন স্টিল ছবি। সমস্ত জঙ্গল জুড়ে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। সন্ধে ঘনিয়ে আসছে কি? এখন বেরিয়ে যাওয়া উচিত। মনটা কেমন অগোছালো হয়ে পড়েছে রেহানের। কিছু কি ফেলে যাচ্ছে এখানে?

ফোনের কথা মাথায় ছিল না। মোবাইলের ফ্লাশ লাইট জ্বেলে ঘরের ভেতরে ফেলল। একটা রুকস্যাক মনে হচ্ছে, ধুলোয় মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে দেওয়াল ঘেঁষে। ওটা কার? না, ওসব নিয়ে আর ভাবাভাবি নয়। এবারে দ্রুত ফিরে যেতে হবে। ড্রাইভার কি ওকে খুঁজছে? নাকি এখনও ঘুমিয়ে আছে? মাথাটা কেমন ঝুম মেরে ছিল এতক্ষণ। এখন একটু একটু করে সমে ফিরছে। ড্রাইভারকে একটা ফোন করতে হবে। ফোনটা করতে গিয়েই চমকে উঠেছে রেহান। ওটা কিসের শব্দ হল?

নিস্তব্ধতাকে ছিঁড়েখুঁড়ে ঝোরার জলে একটা শব্দ হল, ঝপাং! কেউ ঝাঁপ দিয়েছে কি? সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে মাটিতে পা রাখে রেহান। এ আবার কী? কারা এরা? রেহানের চোখের সামনে কয়েকজন সিপাই একটি মানুষকে জল থেকে টেনে হিঁচড়ে তুলে আনছে। একটি অল্পবয়সি ছেলে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছে! ওকে মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে সিপাইরা। মাথায় লাল পাগড়ি।

সঙ্গে সেই ইংরেজ ছাড়াও আরও কয়েক জন দেশি মানুষ রয়েছে। দুজনকে ধুতি পরিহিত দেখল রেহান। হিংস্র উল্লাসে মারছে ওরা ছেলেটাকে। মার খেতে খেতে ছেলেটা চিৎকার করে উঠল 'বন্দেমাতরম! দেখা হবে গঙ্গা! অপেক্ষা করিস।'

সেই প্রতিজ্ঞা শুনতে পেয়ে প্রবল কান্নার রব উঠল বাতাসে। অন্ধকার ঘরের ভেতরে পাক খেয়ে উঠল একটা বডি। অস্ফুটে গুঙিয়ে উঠল। যেন জবাব দিল, যেন কথা দিল। সে অপেক্ষা করবে।

মুহূর্তে রেহান পিছন ফিরল! পালাতে হবে। ওই যে ওদিকে সাঁকো। সাঁকো পেরিয়ে সোজা গাড়িতে উঠে যাবে। আর একমুহূর্ত এখানে নয়। বাপ রে!

রেহান দ্রুত এগোতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। এ কী? সাঁকো কোথায়? সাঁকোটা তো নেই! ঠিক তখনই ওর পিছন থেকে ক্রুদ্ধ সাপের মতো হিস হিস করে কেউ ডেকে উঠল, 'নগে-ন! যেতে পার—বে না—না, না।'

রেহানের শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল। চিনেছে! সেই ঢিবিটাকে চিনেছে। ওর পূর্বপুরুষ নগেন্দ্রনাথ ঠিক ওই ঢিবির মানুষ বা প্রাণীটির মতো দেখতে ছিলেন। ছবি দেখেছে রেহান। ঠিক সেই দৃষ্টি। কিন্তু ওকে কে ডাকল সেই নামে? এখানে কে চেনে তাঁকে? কে-ই বা জানে রেহান নগেন্দ্রনাথের বংশের সন্তান? পিছনে তাকাল রেহান। কেউ নেই কোথাও। হা-হা করছে অনন্ত শূন্যতা।

ঠিক তখন, পানিঝোরা কটেজের ভেতরে একটা মোবাইল বেজে যাচ্ছে। অদ্ভুত রিং টোন। যেন একপাল বুনো কুকুর উল্লাসে চেঁচাচ্ছে।



দীপান্বিতা রায়

দ্বাদশ পর্ব

মোবাইলটা বাজছে। বাজতে বাজতে হঠাৎ থেমে গেল। কেউ কি মোবাইলটা ধরল? এগোতে গিয়েও রেহান পিছন ফিরে তাকাল। বাংলোর বারান্দায় একটা ছেলে। হয়ত ওর চেয়ে একটু বড়ও হতে পারে। মোবাইল কানে দিয়ে কথা বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ঘরের ভিতরে মনে হচ্ছে যেন আরও কেউ আছে।

একটা গলা শোনা গেল। তবে কী বলছে বোঝা গেল না। ছেলেটা কান থেকে ফোন নামিয়ে ঘরের দিকে মুখ করে চেঁচাল, কেকের টিনটা বার কর উৎপল! চা-এর সঙ্গে খাব...!

ছেলেটা দেখতে পেয়েছে রেহানকে। হাত নেড়ে ডাকছে। রেহান ভিতরে ভিতরে চমকে যাচ্ছে। তাহলে এতক্ষণ ধরে সে যা দেখল সেগুলো কী? সবটাই তার নিজের কল্পনা? সে কি কোনওভাবে ঢুকে পড়েছিল সময়ের একটা ফাঁকে? পিছন ফিরে তাকাল রেহান। সাঁকোটা নিজের জায়গাতেই রয়েছে। তার মানে সাঁকো পেরোলেই ওপাশে তার গাড়ি। ড্রাইভার ঘুমোচ্ছে গাড়ির মধ্যে।

চারিদিকে ঝলমলে রোদ। এদিক-ওদিক পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। একটা ট্রি-পাই তার নিজস্ব ভঙ্গিমায় বাদামি ডানা মেলে শরীরটাকে ভাসিয়ে উড়াল দিল গাছের মাথা থেকে।

নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল রেহানের। হাসিও পাচ্ছিল। বোঝাই যাচ্ছে, ওই আদিবাসী লোকটার কথায় বড্ড বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছে। ওর সাইকিয়াট্রিস্ট বন্ধু সুমিত একবার বলেছিল, মানুষ কী দেখছে না দেখছে সেটা অনেকটাই নির্ভর করে তার মনের ওপর। অন্ধকার রাতে রাস্তার পাশের ঝোপের ওপর দিয়ে হাওয়া বয়ে গেলে মনে হয় যেন একটা কালো কাপড় মুড়ি দেওয়া মানুষ নড়ে উঠল। গাছের মাথায় শকুনের বাচ্চার ডাককে মানুষের কান্না বলে ভুল করে ভয় পায়। আসলে সেই সময় তাদের মন ভয় পাওয়ার জন্য, অলীক কিছু দেখা কিংবা শোনার জন্য তৈরি হয়ে আছে! সেজন্যই এরকমটা হয়।

সুমিতের কথাটা তখন পুরোপুরি বিশ্বাস হয়নি রেহানের। কিন্তু এখন মনে হল, ঠিকই বলেছিল সুমিত। আসলে এই পানিঝোরা কটেজটা দেখার পর থেকেই নানারকম অদ্ভুত কল্পনা মনের ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছিল। তার ওপর ওই আদিবাসী লোকটা কীসব বলে গেল। লোকটার চোখদুটোও কেমন যেন। কথাটা ভেবেই নিজের মনকে শাসন করল রেহান।

আসলে তাদের মতো শহুরে মানুষদের কাছে এই আদিবাসীরা যেন এক ধরনের অদ্ভুত জীব। তাদের কথা-বার্তা, হাঁটা-চলা থেকে শুরু করে তাকানো, পোশাক সবেতেই রহস্যের গন্ধ, সভ্য জগৎ থেকে দূরে থাকা একটা অলৌকিক দুনিয়া। লোকটা হয়তো জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ার কিংবা সাপখোপ নিয়ে সাবধান করতে চেয়েছিল রেহানকে। অথচ রেহান ধরে নিল, লোকটা আসলে কোনও অশরীরী জগতের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক মানে উৎপলও বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। হাতে একটা বেগুনি রঙের কেকের বাক্স। বাক্সটা দেখে একটু অবাক হল রেহান। এইরকম বাক্সে কেক বিক্রি করত ক্যারামেল। বছর তিনেক হল কোম্পানিটা উঠে গেছে। শিলিগুড়িতে হয়তো এখনও দু-একটা দোকান আছে। অন্য ভদ্রলোক ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালছেন। বোঝাই যাচ্ছে দুজনেই সমবয়সি বন্ধু।

পানিঝোরা কটেজ দেখতে এসেছেন?

হ্যাঁ বলতে পারেন। আসলে ছবি তুলতে এসেছি। পাখির ছবি। ডুয়ার্স তো বলা যায় পাখির স্বর্গরাজ্য। আপনারা কী এখানে উঠেছেন? আমি তো শুনেছিলাম এই কটেজটা ফাঁকাই থাকে।

না না! ফাঁকা থাকবে কেন? আমরা আছি তো। ও উৎপল আর আমি অতীন...।

ক'দিন আছেন? কলকাতায় থাকেন?

কথা বলতে বলতে বারান্দায় উঠে এসেছে রেহান। একটা অদ্ভুত আঁশটে গন্ধ। বাসি রক্তের গন্ধ যেমন হয়। ঝলমলে রোদটা সরে গেল হঠাৎ। একটুকরো কালো মেঘ এসে ঢেকে দিয়েছে সূর্যকে। এক ঝলক স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডা হাওয়া বয়ে গেল। গা-টা শিরশির করে উঠল রেহানের। হঠাৎ মনে হল, তার পাশ দিয়ে কিছু একটা যেন চলে গেল। একটা রোমশ শরীর। কিন্তু দেখা গেল না কিছু।

অস্বস্তি হচ্ছিল রেহানের। মনে হচ্ছিল, এদের ডাক শুনে না এলেই হত। কটেজের দরজাটা এখনও ঠিক আগের মতো অল্প একটু ফাঁক করা। ভিতরটা অন্ধকার। একটু আগে যখন ভিতরে উঁকি দিয়েছিল, তখন কিন্তু এদের কাউকে দেখতে পায়নি। কোনও আওয়াজও শোনেনি।

নাহ, আবার সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। তখন যা দেখেছে সবটাই তো তার কল্পনা। বাস্তবে ফিরতে জোর করে নিজের মাথা ঝাঁকাল রেহান। অতীন কেমন যেন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে। চাউনিটা বেশ অদ্ভুত। রেহানের প্রশ্নটা শুনেছে। একটু আগের অমায়িক হাসিটা এখন উধাও। পাথুরে মুখে বলল, আছি তো এখানেই। ইদানীং এখানেই আছি। হ্যাঁ, কলকাতারই লোক। আমরাও কলকাতার। ওরাও তখন কলকাতাতেই ছিল।

কারা কলকাতায় ছিল?

বলতে বলতেই রেহান দেখল ঘর থেকে আরও দুটো ছেলে বেরিয়ে এসেছে। তাদের বয়স এদের থেকে কম। পরনের পোশাকও বেশ অদ্ভুত। দুজনেই পরেছে ঢোলা হাফ প্যান্ট আর শার্ট। ঠিক এইরকম পোশাক পরা একটা ছেলেকেই একটু আগে কড়িকাঠ থেকে ঝোলাতে দেখল না রেহান? কিন্তু সেই ছেলেটা তো মরে গেছে! কাকে জল থেকে তুলল সেপাইগুলো? রেহান বুঝতে পারছে সে একটা ঘেরাটোপের মধ্যে আটকে গেছে। আকাশে মেঘ ক্রমশ ঘন হচ্ছে।

ওরাও কলকাতাতেই ছিল জানেন তো? এইরকম একটা বাড়িতে ছিল...।

কথা বলতে বলতে বারান্দার উল্টোদিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেছে উৎপল। ওর সঙ্গে অতীন। ওই ছেলেদুটোও ওদের পাশে রয়েছে। কিন্তু ওরা কি চারজন? নাকি দুজন? ঠিক বুঝতে পারছে না রেহান। হাফপ্যান্ট পরা ছেলেদুটো একবার ওদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে আবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে, ওদের পিছন পিছন এগিয়ে যাচ্ছে রেহানও। যেতে ইচ্ছে করছে না একটুও। কিন্তু না গিয়ে কোনও উপায় নেই। রেহান বুঝতে পারছে পাগুলো মোটেই আর তার বশে নেই।

বাংলোর পিছনদিকটা কী ভীষণ অন্যরকম! পাহাড়, জঙ্গল কিছুটি নেই। শুধু মেঘলা আকাশটা একটা লোমওলা কালো বেড়ালের মতো ঝুলে আছে। টিপটিপ বৃষ্টিও শুরু হল। একটা সরু বাঁধানো গলি। গায়ে গায়ে বাড়ি।

গলির মোড়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল। দুটো ছেলে নামল সেটা থেকে। মালকোঁচা দিয়ে ধুতি আর শার্ট পরা। গাড়ির ভিতরে আরও একজন কেউ আছে। সে হাত বাড়িয়ে দুটো বাক্স আর ঝোলা এগিয়ে দিল ছেলেদুটোর দিকে।

তোরা এগো। আমি ভাড়া মিটিয়ে আসছি...।

চাপা খসখসে গলা। ছেলেদুটো মাথা নেড়ে এগোতে তৃতীয়জন লাফ দিয়ে নামল গাড়ি থেকে। পকেট থেকে খুচরো পয়সা বার করে গুনছে। রাস্তার কেরোসিন ল্যাম্পের আলো পড়েছে ছেলেটার মুখে। তার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল রেহান!

আগের ছেলেদুটো এগিয়ে যাচ্ছে জোর পায়ে। একটা বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল ওরা। পিছনে রেহান। আধো অন্ধকার উঠোন। তারপর সিঁড়ি। টিমটিমে আলো জ্বলছে। হলুদ বাল্বের আলো। সিঁড়ির মুখে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটার মুখটা চেনা চেনা। একেই কি কড়িকাঠ থেকে ঝুলতে দেখেছিল রেহান? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

মুখটা তখনও কেমন যেন বীভৎস হয়ে ছিল। ঠোঁটের দুপাশে কালশিটে আর কাটা দাগ। ফোলা নীলচে কপাল। এই ছেলেটা কিন্তু দিব্যি সুশ্রী। পাতলা গোঁফ। চোখদুটো বালবের ঢিমে আলোতেও যেন চকচক করছে।

গঙ্গা আইলি?...

চাপা গলা। কিন্তু কথার ভিতরে একইসঙ্গে খুশি আর উদ্বেগের আভাস। সামনের ছেলেটা এগিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল ওকে, মিশন সাকসেসফুল কৃষ্ণ...!

সে কি আর জানি না। কয়দিন ধইরা শহর এ নিয়া তোলপাড় হচ্ছে। কাগজউলারা একেবারে হন্যে হইয়া আছে। সবার চোখের সামনে শ্যামপুর থানা লুঠ। অতগুলান বন্দুক, গুলি নিয়ে পলায়ে গেল ছোকরারা! রিচার্ডসন নাকি বলছে যে, সেসময় ও থানায় ছিল না। তাই এমন ঘটনা ঘটেছে। ও থাকলে স্বদেশী শয়তানদের খ্যামতা হইত না থানা লুঠ করা!

ওটাই তো আপশোশ রয়ে গেল রে কৃষ্ণ। ব্যাটা রিচার্ডসন ছিল না। থাকলে ওটাকেও একেবারে নিকেশ করে আসতাম...।

হ্যাঁ রে, তোরা তিনজনাই আইছস তো?

হ্যাঁ। বাবুলদার বাড়িতে থাকাটা নিরাপদ হচ্ছিল না। তাছাড়া অমিয় আর নগেনও ব্যস্ত হচ্ছিল। নগেনকে একবার বাড়ি যেতে হবে। ওর বাবা নাকি অসুস্থ।

এডা কী কস! নগেন এই সময় বাড়ি যাইব?

না রে। একবার যেতেই হবে। মা বড্ড কান্নাকাটি করছে। লুকিয়ে যাব আর ফিরে আসব।

তিন নম্বর ছেলেটার চাপা খসখসে গলা। মুখটা এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

তাইলে আইজই এখান থিক্কা চইলা যাস। বড় রাস্তা ধইরা বেরাস না। পিছনের গলি দিয়া বেরায়ে কালী মন্দিরের পাশ দিয়া অ্যাক্কেরে গিয়া ঠনঠনের মোড়ে উঠিস। তবে হ্যাঁ, তার আগে সব কিছু গুছাইয়া রাখতে হইব। এবারে বল শুনি, কী কী পাইছস?

চারটে বন্দুক পেয়েছি। দুটো রিভলভার। তারমধ্যে একটা মনে হয় রিচার্ডসনের। আলমারিতে রেখে গেছিল। বড়বাবুর কাছ থেকে চাবি ছিনিয়ে নিয়ে আলমারি খুলে বার করলাম। সে ব্যাটা কেঁদে অস্থির। তার নাকি চাকরি চলে যাবে। এই ব্রিটিশের গোলামগুলো কুকুরের চেয়েও খারাপ।

অপদার্থও বটে। অতবড় একটা থানা, পাহারায় যেন কোনও গা-ই নেই। সবাই আলগা দিয়ে বসেছিল...

সে কী কস! আলগা দেওয়ার তো কথা নয়। মেদিনীপুরের ট্রেজারি আর খুলনায় থানা লুঠের পর শুনছিলাম দারোগাদের ডাইকা আলাদা করে বলা হইছিল... হেই গঙ্গা! এর পিছনে আবার কুনও চাল নাই তো?

চাল আবার কী থাকবে কৃষ্ণ? ফাঁদের কথা বলছিস তুই? কিন্তু ফাঁদ হলে তো আমরা ধরা পড়ে যেতাম।

তাও ঠিক। তবু ক্যামনে যেন মনের ভিতরটা খচখচ করত্যাছে। তোরা এখানে সব নিয়া আইসা ভালো করছস। এই আস্তানাটার খবর এখনও দলেরও সবাই জানে না। শোন, আমার ঘরের মাটির নীচে একটা বড় গর্ত খোঁড়া আছে। কাঠের তক্তা চাপা দিয়া রোহিনী ওর ওপর মাটি লেইপা দিছে। আগের জিনিসগুলান ওখানে আছে। এগুলানও তার সঙ্গে রেখে দে। গুলিগুলান খবরের কাগজে মুড়ে চটের বস্তায় ভইরা দিবি। সামনের সপ্তাহে লোক আসব। তখন সব হাতে হাতে পৌঁছায়ে দেব। কাজ হইয়া গেলে রোহিনীকে ডাইকা বলবি আবার যেন মাটি লেইপা দেয়। আমি ওপরে যাই। ওপরে অমূল্য, সত্যেন ওরা সব আইছে। ওদের এখনই কিছু বলার দরকার নাই...।

অমিয় আর গঙ্গা বাক্স-ঝোলাগুলো নিয়ে বারান্দার ওপাশে একটা ঘরের দিকে চলে গেল। কৃষ্ণ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। তার পিছনে নগেন।

রেহানের মনে হচ্ছে, তার শরীরটাও যেন একবার নগেনের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে আবার আলাদা হচ্ছে।

দোতলা উঠে একটা লম্বাটে মতো ঘর। কতগুলো ছেলে বসে আছে। মাটিতে সতরঞ্চি পাতা। ছেলেগুলো ওর দিকে পিছন ফিরে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না। ঘরে আলো বেশ কম। রেহান সেই হাফপ্যান্ট পরা ছেলেদুটোকে খুঁজছিল।

কৃষ্ণ এসে সামনে রাখা একটা চেয়ারে বসল। আলোটা ঠিক তার মাথার ওপর। এখন কৃষ্ণর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রেহান। তার শিরদাঁড়ার নীচটা শিরশির করছে।

এই ছেলেটাই তো তখন উতল-অতীনদের সঙ্গে আসছিল। কিন্তু তখন ও একটা ঢোলা হাফপ্যান্ট পরে ছিল। আবার এই ছেলেটাকেই তো ও কটেজের কড়িকাঠ থেকে ঝুলতে দেখেছিল।

তাহলে আসল কৃষ্ণ কোনটা? মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল রেহানের। সে বুঝতে পারছিল তার এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার।

কৃষ্ণ সতরঞ্চির সামনে রাখা একটা চেয়ারে বসে পড়েছে। বেশ জোরালো গলায় অন্যদের বলছে, ভাইসব, এইডা আমাদের বুইঝা নিতে হইব যে, ইংরেজদের যদি দেশ থিক্কা তাড়াইতে হয়, ওইসব আবেদন-নিবেদন, ভিক্ষার ঝুলি নিয়া দাঁড়ানোয় কুনও কাজ হইব না। পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও এমনটা হয় নাই। শাসক কখনও নিজে তার ক্ষমতা প্রজাদের হাতে তুইলা দেয় না। দেয় তখনই যখন সে বাধ্য হয়। আর বাধ্য যদি করতে হয়, তাইলে তাদের ভয় দেখাইতে হইব। এমন ভয় যাতে তারা নিজেদের বিপন্ন বোধ করে। এ খুবই কঠিন কাজ ভাইসব। কারণ সব ক্ষমতা তাদের হাতে। কিন্তু তবু এইডাই একমাত্র পথ। আমরা যারা অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত তাদের এইপথেই...

রেহান বুঝতে পারছিল, তাকে কেউ খেয়াল করছে না। শুধু নগেন একেবারে তার গায়ের সঙ্গে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নগেনকে নিজের থেকে আলাদা করতে পারছে না রেহান। কিন্তু সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। আর অপেক্ষা করা যাবে না।

রেহান নিঃশব্দে আবার নেমে এল সিঁড়িটা দিয়ে। অমিয়, গঙ্গা কাউকেই আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু পিছন দিকের ঘর থেকে চাপা গলায় কথাবার্তার আওয়াজ আসছে। উঠোন পেরিয়ে দরজার বাইরে এসে একবার এদিক-ওদিক দেখল রেহান। তারপর বাড়িটা ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে যেতেই ল্যাম্পপোস্টের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা লোক। রেহান ইশারায় তাকে দোতলাটা দেখিয়ে দিল। লোকটা আর একটু এগিয়ে এসে ফিসফিস করল কানের কাছে, সবাই আছে?

চাপা খসখসে গলায় উত্তর এল, সবাই। কৃষ্ণ, গঙ্গা দুজনেই আছে।

আর মালপত্র? সেসবও কি এখানে এনে রেখেছে?

বারান্দার পিছন দিকের ঘরে, মাটির নীচে দেখতে হবে। কাঠের তক্তার ওপর মাটি লেপা আছে।

লোকটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। দ্রুতপায়ে গলিটা পেরোচ্ছে রেহান। পিছনে পুলিশের বাঁশির শব্দ। তার পাশ দিয়েই বুটপরা পাগুলো ছুটছে দোতলা বাড়িটার দিকে। গলির মুখে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। বাবা গাড়ি পাঠিয়েছে। একবার গাড়িতে উঠতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

কৃষ্ণ ঠিকই ধরেছিল। শ্যামপুর থানা লুঠটা আসলে ফাঁদ। নগেন ওদের সঙ্গে থাকবে, রিচার্ডসন জানত। ইচ্ছে করেই সেসময় থানায় ছিল না। পাহারা আলগা ছিল। লুঠ করার পর ওরা কখন কোথায় থাকছে, সব খবর সময়মতো পৌঁছে দিচ্ছিল নগেন। কৃষ্ণ আর গঙ্গাকে বমালসমেত একসঙ্গে ধরবে বলেই ফাঁদ পেতেছিল ব্রিটিশ পুলিশ।

গলিটা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু গাড়িটা দেখা যাচ্ছে না তো? একটা মাঠ। আবছা কুয়াশার ভিতর দিয়ে পানিঝোরা কটেজটা দেখতে পাচ্ছে রেহান। কটেজের পরে বাঁশের সাঁকো। তার ওপারেই তো ওর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ওকে পৌঁছে দেবে নিরাপদ জায়গায়। কৃষ্ণরা ওর সন্ধানই পাবে না।

কিন্তু সাঁকোটা দেখা যাচ্ছে না কেন? রেহান ঝোরাটা পেরোবে কী করে? হিমের মতো ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। একটা ভীষণ পচা গন্ধ। কাছে-দূরে নানারকম অদ্ভুত আওয়াজ। কাকে যেন চাবুক মারা হচ্ছে। তীব্র-

তীক্ষ্ন আর্তনাদ বাতাসে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। দো-আঁশলা ইংরেজিতে কুৎসিত ভাষায় কে যেন গালিগালাজ করছে।

হিংস্র চিৎকার করে রেহানের ঠিক পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল একটা বিশাল রোমশ জন্তু। তার কর্কশ লোমগুলো রেহানের শরীর ছুঁয়ে গেল। পালানোর জন্য পাগলের মতো সামনের দিকে ছুটতে গিয়েই থমকে গেল রেহান।

ওরা কারা এগিয়ে আসছে? ঢোলা হাফপ্যান্ট পরা দুজোড়া পা। মাটিতে ঠেকে নেই পাগুলো। কোন এক অদৃশ্য দড়ি থেকে যেন ঝুলছে দুজনে। দুটো মানুষ! কিন্তু মুখ নেই। শরীর নেই। শুধু দুই অক্ষিকোটরে যেন ধকধক করছে আগুনের গোলা। ছুরির মতো ঠান্ডা বাতাস হিসহিস করছে ওর কানের পাশে।

তুই...তুই...নগেন...তুই পুলিশের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলি...ব্রিটিশের সঙ্গে ফাঁদ পেতেছিলি...তুই বিশ্বাসঘাতক!!

শক্ত সাঁড়াশির মতো দুজোড়া হাত এগিয়ে আসছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। রেহান বুঝতে পারল সেই ঢিবিটা আবার জ্যান্ত হয়ে উঠেছে! সেটা গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে আসছে তাকে গিলে ফেলার জন্য!



অভীক সরকার

ত্রয়োদশ পর্ব

সম্বিৎ ফিরে পেতে রেহান দেখল, ওর মুখের ওপর একজোড়া উৎকণ্ঠিত মুখ ঝুঁকে আছে, রোদেলা আর ড্রাইভার। ও চোখ খুলতেই রোদেলা একবার ঝাঁকিয়ে দিল ওকে, রেহান, রেহান, কী হয়েছে তোর? এখানে শুয়ে আছিস কেন? শরীর খারাপ লাগছে?

রেহান উঠে বসে একবার মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিল। মাথাটা ভার হয়ে আছে। বুকের ভেতর একটা হাপর উঠছে পড়ছে। কোনওরকমে রোদেলাকে জিগ্যেস করল, তুই কীভাবে এলি?

আমি ধূপগুড়ি থেকে লাইনের ট্রেকার ধরে এখানে এসে নেমে পড়লাম। দেখলাম তোর গাড়িটা সাঁকোর ওদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ড্রাইভার-দাদাকে জিগ্যেস করতে বলল, তুই নাকি অনেকক্ষণ আগেই কটেজের ভেতরে ঢুকেছিস!

ড্রাইভার কাঁপা গলায় বলল, যিতনা জলদি হো সকে, ইঁহা সে নিকল চলিয়ে সাব। ইয়ে জগহ ঠিক নেহি হ্যায়। আজ সে দো সাল পেহলে মেরে গাঁও কা এক বান্দা কলকাত্তাসে দো সাবলোগোঁ কো লেকর ইঁহা আয়া থা। আভি তক লা পাতা হ্যায়!

রেহান কথাটায় কান দিল না। তার মাথায় ঘুরছে অন্য ভাবনা। উঠে পড়ে রোদেলাকে বলল, আমার সঙ্গে একবার আয় তো!

দ্রুতপায়ে রেহান পেরিয়ে যেতে লাগল বাংলোর সামনের সবুজ রুমালের মতো পড়ে থাকা ছোট মাঠটা। আকাশে ঘিরে এসেছে ঘন কালো মেঘেদের দল। সামনে ঘন সবুজ পাহাড়ি অরণ্য। তার বুক থেকে নেমে এসেছে বিষণ্ণ গম্ভীর পানিঝোরার স্রোত। এই সমস্ত দৃশ্যপটের মধ্যে অশরীরী অভিশাপের মতো জেগে আছে পানিঝোরা বাংলো।

বারান্দায় উঠতে উঠতে চারিদিক কালো হয়ে এল। সোঁ-সোঁ করে ধেয়ে এল পাহাড়ি দামাল হাওয়ার দল। রেহান উঠেই স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর রোদেলাকে ফিসফিস করে বলল, শুনতে পাচ্ছিস?

বলার দরকার ছিল না। বারান্দায় দাঁড়িয়েই শোনা যাচ্ছিল, বন্ধ দরজার ওপাশে ভারী কিছু টেনে নিয়ে যাওয়ার শব্দ। একটা ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ! একটা চাপা আর্তনাদ!

আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে দরজাটা খুলল রেহান। তারপর দুজনে স্থাণু হয়ে গেল।

তাদের চোখের সামনে পানিঝোরা বাংলোর ঘরটা যেন আতঙ্কে আর বিভীষিকায় দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে। ঘন অন্ধকারের মধ্যে বদলে বদলে যাচ্ছে ঘরের ভেতরের দৃশ্যপট! যেন অনেকগুলো চলমান ছবি আঁকড়ে ধরতে চাইছে একে অন্যকে। দুটো ছেলে, পরনে ঢোলা খাকি হাফপ্যান্ট, কাদামাখা জমিতে বুক ঘষটে ঘষটে হাঁটছে। পালাতে চাইছে ওরা...পেছনে অনেকগুলো হুইসলের শব্দ! একটা কুকুরের ডাক।

আবার বদলে গেল চিত্রটা! গাছের ডাল থেকে ঝুলছে একটা পাহাড়ি মানুষের দেহ। তার দিকে হাসতে হাসতে বন্দুক তাক করে একটার পর একটা গুলি চালাচ্ছে এক বিদেশি নারী। একটা গুলি লাগল ঝুলে থাকা মানুষটার পেটে!

যন্ত্রণায় ঝুলন্ত শরীরটা মোচড় দিয়ে উঠল। সঙ্গে আরও দুজন ব্রিটিশ অফিসার, একজনের হাতে চাবুক, আরেকজনের হাতে মিলিটারি বন্দুক। তারা পাগলের মতো হাততালি দিতে দিতে উন্মত্ত উল্লাসে ফেটে পড়ছে, 'শ্যুট অ্যাট দ্য হেড, মার্থা, কিল দ্যট ভার্মিন।'

আবার পালটে গেল দৃশ্যপট! দুজন পুরুষ দৌড়ে এসে ঢুকছে বাংলোয়। কেয়ারটেকারকে ডাকছে। ওদের মধ্যে একজন কী যেন একটা দেখে খুব ভয় পেয়েছে। ওই তো...ওদের একজন মোহগ্রস্তের মতো এগিয়ে

যাচ্ছে ঝরনার দিকে। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল লোকটা। আবার কিছু দৌড়ে আসার শব্দ। একপাল বুনো কুকুর ডাকছে কোথাও।

এবার ঢোলা প্যান্ট পরা একটা ছেলের দেহ ঝুলছে সিলিং থেকে। তার ওপর চাবুকের পর চাবুক চালাচ্ছে এক সাহেব, এক হাতে মদের গ্লাস, আরেক হাতে শঙ্করমাছের লেজের চাবুক। বাংলোর পেছনের জঙ্গল থেকে কার যেন ক্ষীণ আর্তস্বর ভেসে এল, 'গঙ্গা-আ-আ...গঙ্গা রে...!'

রেহানের পাদুটো থরথর করে কাঁপছে, ওর মনে হচ্ছে যেন এক্ষুনি পড়ে যাবে। বাইরে বৃষ্টি নেমেছে প্রবল জোরে। বৃষ্টির ধারালো ছাঁট চাবুকের মতো ওর চোখেমুখে আছড়ে পড়ছে। পানিঝোরার বুক ফুলে উঠেছে ভীম আক্রোশে। জলের তোড়ে ছোট সাঁকোটা দুলছে পাগলের মতো। যেকোনও মুহূর্তে জলের তোড়ে ভেসে যেতে পারে। স্বয়ং কালভৈরব যেন মদমত্ত হয়ে শূল হাতে নেমে এসেছেন এই পাহাড়ের কোলে।

রেহানের সামনে এখন আর কিছু নেই। রোদেলা অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে।

একজোড়া চোখ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে। তার শ্বদন্ত ঝিকিয়ে উঠছে এই অন্ধকার ফালা ফালা করে দেওয়া বিদ্যুতের মতো। একটু নীচু হল প্রাণীটা। এবার ঝাঁপ দিতে যাবে রেহানের ওপর!

ঠিক সেইসময় কে যেন পেছন থেকে রেহানের পায়ের গোছটা চেপে ধরল।

তুই কী বলছিস, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না রেহান!

আমার এখানে আসাটা নিয়তির বিধান ছিল রে রোদেলা। শুধু তোকে যে জড়িয়ে পড়তে হল এর মধ্যে, সেটা আমি একেবারেই চাইনি! বিশ্বাস কর।

রোদেলা স্নান করে নিয়েছে ইতিমধ্যেই। পরনে একটা পালাজো আর টি-শার্ট। সে শক্ত ধাতের মেয়ে, দুপুরের ধাক্কাটা ইতিমধ্যেই কাটিয়ে উঠেছে। রেহানও স্নান করে নিয়েছে। তবে তার শকটা একটু বেশি, এখনও ঘটনার অভিঘাত কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সারা গায়ে একটা মোটা চাদর জড়িয়ে বসে আছে সে। তার হাতে একটা গরম কফির পেয়ালা। রোদেলাই বানিয়ে এনেছে সেটা।

ওরা এসে উঠেছে আলিপুরদুয়ারের হোটেল বঙ্গবাসীতে। বুদ্ধিটা অবশ্য ওদের ড্রাইভার বাজবাহাদুর গুরুংয়েরই। অনেকক্ষণ ধরে বাবুসাহেবরা আসছেন না দেখে সে নিজেই সাঁকো পেরিয়ে বাংলোর কাছে গেছিল, কী হচ্ছে সেটা দেখতে। বাংলোর বারান্দায় মেমসাব অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন, আর রেহান সাব পাগলের মতো আচরণ করছেন দেখে সে-ই বারান্দায় দাঁড়ানো রেহানের পা চেপে ধরেছিল।

নিয়তি-টিয়তি আবার কী? কী যে বলছিস কিছুই বুঝতে পারছি না। বিরক্তি প্রকাশ করে রোদেলা।

বাজবাহাদুর না দেখলে আজ আমরা ওখানেই মরে ভূত হয়ে থাকতাম রোদেলা। ওই অভিশপ্ত বাংলো আমাদের গিলে খেত।

রোদেলার হাতেও একটা কফির মগ। সেটাতে একটা চামচ দিয়ে সে নাড়াচ্ছে। আনমনে বলল, বাজবাহাদুর বলল ও নাকি অত বৃষ্টি, ঝড়, পানিঝোরার জল ফুলে ওঠা, কিছুই দেখেনি। সবকিছু নাকি একদম স্বাভাবিক, নর্ম্যাল ছিল। তাহলে আমরা যে অত কিছু দেখলাম, সব কি আমাদের চোখের ভুল?

চোখের ভুল নয় রোদেলা। আজও ওই বাংলোয় রহস্যময় ঘটনা ঘটে। ওখানে কেউ যায় না। আমিও চাইনি আজ ওখানে যেতে। কিন্তু সকাল থেকেই, কেন জানি না...আমার মাথার মধ্যে একটা অস্বস্তি কাজ করছিল। কে যেন আমাকে বার বার বলছিল ওদিকে যেতে। বিশ্বাস কর রোদেলা, আমি চেষ্টা করেছিলাম সে কথা না শুনতে। কিন্তু...কিন্তু...

রোদেলা কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে ঠান্ডা মাথায় পুরো ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখল। আজ পানিঝোরা বাংলোয় ওরা যেটা দেখেছে, সেটা অস্বাভাবিক তো বটেই। ওদের মধ্যে একজন দেখলে সেটাকে

না হয় তার মানসিক বিকার বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু ওই বাংলোয় আজ ওদের দুজনের চোখের সামনে যা যা ঘটেছে, দুজনেই তার প্রত্যক্ষদর্শী। চট করে সেটাকে দৃষ্টিবিভ্রম বলে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন।

তুই কিসের নিয়তির কথা বলছিস রেহান?

রেহান শূন্য দৃষ্টিতে জানালার কাচের দিকে চেয়েছিল। আচ্ছন্নের মতো বলতে শুরু করে সে।...

নগেন মিত্তির, ওরফে নগেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন স্বাধীনতা উত্তরকালে মধ্য কলকাতার সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক নেতা। সেই সময়ে রাজ্য সরকার তাঁর অঙ্গুলিহেলনে চলত, এমনই ছিল তাঁর দাপট।

স্বাধীনতা পাওয়ার পর চড়চড় করে নগেন্দ্রনাথের সম্পত্তির পরিমাণ বাড়তে থাকে। গিরিশ পার্কের পাশে বিশাল বাড়ি হাঁকান। একদঙ্গল চাকরবাকর, গ্যারেজে তিনটে গাড়ি, দামি জামাকাপড়, নিত্যি নতুন পার্টি। লোকের চোখ টেরিয়ে যেত।

যাদের চোখ টেরাত না, তারা অবশ্য অন্য কথা বলত।

নগেন মিত্তিরের বাপ ছিলেন সে যুগের মস্তবড় ব্যবসায়ী। সাহেবদের সঙ্গে বিশাল দহরম-মহরম ছিল। সেই পরিবারের ছেলে হয়েও কৈশোরে নগেন মিত্তির ছিলেন অনুশীলন সমিতির সভ্য। পরে যুগান্তরে যোগ দেন।

ক্ষুরধার বুদ্ধির লোক ছিলেন নগেন্দ্রনাথ। তার ওপর জন্মসূত্রে ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে বলে হিসেবপত্রও ভালোই বুঝতেন। দ্রুত যুগান্তরের কর্তাব্যক্তিদের নজরে পড়ে যান, ধীরে ধীরে যুগান্তরের সমস্ত হিসেবপত্র নগেন মিত্তিরের হাতের মুঠোয় চলে আসে। তখন স্বাধীনতাকামী জনতার মনে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছেন যুগান্তরের দুই উঠতি তরুণ বিপ্লবী। গঙ্গা আর কৃষ্ণ! তাদের রক্ত গরম করা বক্তৃতা দেশের তরুণদের বুকে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। তাঁদের মাথার দাম ধার্য হয়েছে হাজার টাকা করে। সমাজের নানা স্তরের লোকেদের গোপন দানে ফুলে ফেঁপে উঠছে যুগান্তরের তহবিল।

কিন্তু নগেন্দ্রনাথের মনে সুখ ছিল না।

তাঁর মনে হচ্ছিল, এই রাস্তাটা ভুল। দু-একটা দিশি সিপাই আর লালমুখো সাহেব খুন করে দেশের স্বাধীনতা আসবে না। দেশের যুবশক্তির এই বিশাল আবেগী কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে, অপচয় হচ্ছে! মনে মনে বিতৃষ্ণ আর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিলেন তিনি, যুগান্তর ছেড়ে দেওয়ার ফিকির খুঁজছিলেন। অথচ যে গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন সেখানে নেতৃবৃন্দের সামনে এই ইচ্ছে ব্যক্ত করার একটাই অর্থ, সংশোধনবাদী বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত হয়ে যাওয়া।

এমন সময় হঠাৎ করেই নগেন্দ্রনাথের সামনে একটা সুবর্ণ সুযোগ চলে আসে।

যুগান্তরের নেতৃবৃন্দ বিদেশ থেকে সাহায্য আনার চেষ্টা করছিলেন অনেকদিনই। জার্মানিতে যুগান্তরের কনট্যাক্ট ম্যান ছিলেন এক নেপালি ভদ্রলোক, নাম তেজবাহাদুর গুরুং। তিনি বহুকষ্টে ইওরোপের প্রবাসী ভারতীয়দের একত্র করে তখনকার দিনে প্রায় এক লাখ মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা ভারতে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। সেই স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে ভারতের পথে তেজবাহাদুর নিজেই রওনা দেন। পুরো ব্যাপারটা গোপন ছিল। তেজবাহাদুর ছাড়া এটা জানতেন শুধু গঙ্গা, কৃষ্ণ আর নগেন্দ্রনাথ নিজে।

যেদিন জাহাজঘাটায় জার্মানির জাহাজ ভেড়ে, সেদিন তেজবাহাদুরকে স্বাগত জানাতে যুগান্তরের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন একজনই, নগেন মিত্তির। তিনি তেজবাহাদুরকে জাহাজ থেকে নামতেই বুকে জড়িয়ে ধরেন। যুগান্তরের গোপন পাঞ্জা দেখান। তারপর একটা ঘোড়ায় টানা গাড়িতে তেজবাহাদুরকে শহরের নামি সরাইখানায় তুলে দেন। তেজবাহাদুরও নগেন্দ্রনাথকে অসীম কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সেই স্বর্ণমুদ্রা তাঁর হাতে হস্তান্তরিত করেন।

সেই রাতেই ধরা পড়েন কৃষ্ণ, গঙ্গা, তেজবাহাদুর সহ যুগান্তরের প্রায় সমস্ত নবীন সদস্য। তাঁদের এই বক্সা ফোর্টে চালান করে দেওয়া হয়। যুগান্তরের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ উপায়ান্তর না দেখে গা ঢাকা দেন। আর নগেন মিত্তির? রাতারাতি হাওয়ায় মিলিয়ে যান।

কিন্তু এই গল্পের সঙ্গে আমাদের আজকের ঘটনার কী সম্পর্ক? বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করে রোদেলা, আর তোর নিয়তির প্রশ্নটাই বা আসছে কোথা থেকে?

ম্লান হাসে রেহান, নগেন মিত্তির ফের ভেসে ওঠেন স্বাধীনতার পর। মুঠো মুঠো টাকা ছড়িয়ে একজন প্রভাবশালী নেতা হয়ে বসেন। কিন্তু এত টাকা তিনি পেলেন কোথায়? সে ব্যাপারে অনেক কানাঘুষো ছিল। যুগান্তরের অনেকের কানেই তেজবাহাদুরের আনা লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণমুদ্রার কথা পৌঁছেছিল। তাঁরাই রটিয়ে দেন যে টাকার লোভে নগেন মিত্তির কৃষ্ণ, গঙ্গা আর তেজবাহাদুরকে ধরিয়ে দিয়ে গা ঢাকা দেন।

কিন্তু রেহান, আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও পাইনি!

নগেন মিত্তির মারা যান অপঘাতে। তাঁর ছেলেও তাই। এমনকী তাঁর ছেলের ছেলেও। আজ অবধি মিত্তির ফ্যামিলির কোনও পুরুষের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। মিত্র পরিবারে একটা কথা প্রচলিত আছে। বক্সা ফোর্টের কাছে কোনও এক সাহেবি বাংলোয় কৃষ্ণ, গঙ্গা আর তেজবাহাদুরকে অকথ্য অত্যাচার করে মেরে ফেলা হয়। তাদের দেহ সেখানেই কোথাও পুঁতে রাখা আছে। সেই থেকে সেই বাংলো অভিশপ্ত। যতদিন না মিত্র পরিবারের কেউ গিয়ে নিজের পাপ স্বীকার করে সেই অতৃপ্ত আত্মাদের মুক্তি দেবে, ততদিন ধরে সেই বাংলোর গ্রাস থেকে কারও নিস্তার নেই।

কিন্তু রেহান—বলতে গিয়েই কথা আটকে যায় রোদেলার। তাহলে কি ও যা ভাবছিল সেটাই সত্যি?

রোদেলার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনের প্রশ্নটা বুঝতে পারে রেহান। ম্লান হেসে বলে, তুই যা ভাবছিস সেটাই সত্যি রে রোদেলা। আমি সেই নগেন্দ্রনাথ মিত্র'র পরিবারের ছেলে! রেহান মিত্র।





দেবারতি মুখোপাধ্যায়

চতুর্দশ পর্ব

হোটেল বঙ্গবাসী থেকে রুদ্ধশ্বাসে গাড়ি চালিয়ে ওরা তিনজন যখন আবার পানিঝোরার দিকে ফিরে আসছিল, ততক্ষণে সূর্যদেব পশ্চিমদিকে অস্ত যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছেন। পাখিরা ধীরে ধীরে ফিরে যাচ্ছে নিজেদের বাসায়। প্রকৃতি সারাদিনের পরিশ্রমের পর নরম আলোয় ভরিয়ে তুলছে চারপাশ।

স্টিয়ারিং হাতে গাড়ি চালাতে চালাতে অনবরত ব্যাজার মুখে বিড়বিড় করে যাচ্ছিল ড্রাইভার বাজবাহাদুর। তার একটুও আসার ইচ্ছে ছিল না। বারবার সাধ করে কে এমন বিপজ্জনক জায়গায় যেতে চায়? বিশেষত যে জায়গার এত বদনাম?

কিন্তু এই কলকাতার বাবু একেবারে নাছোড়বান্দা। প্রথমদিনই চুক্তি হয়েছিল, এই তল্লাটে ওরা যেখানে বলবে, সেখানেই বাজবাহাদুরকে যেতে হবে। আর সেই ফাঁদে পড়েই আবার রিকুংদাজুর লাওয়ারিশ হয়ে যাওয়ার জায়গায় ওকে যেতে হচ্ছে।

রেহান উদাসমুখে জানলা দিয়ে বাইরের অপরূপ নিসর্গ দেখছিল। অন্যবার পাখির ছবি তুলতে ও এতই ব্যস্ত থাকে, নির্ভুল শিকারীর মতো প্রকৃতির হাজারো শব্দের ভিড়ে কোনও পাখির কলতান চিনে নিয়ে ক্যামেরার শাটার টেপাটাই হয় ওর প্রধান লক্ষ্য। সেই নেশায় নাওয়া-খাওয়াও ভুলে যায়। একটা ঠিকঠাক ছবি তুলতে পারলে মনে হয় দিনটা সার্থক।

কিন্তু এবার? এবার সব হিসেব ওলটপালট হয়ে গিয়েছে! বার্ডার রেহান মিত্র আপাতত বার্ড ফটোগ্রাফি শিকেয় তুলে খুঁজতে চলেছে নিজের পরিবারের এক কলঙ্কের ইতিহাস। পূর্বপুরুষের অপরাধের বোঝা যেন ক্রমশ তার মাথাকে গ্রাস করে ফেলছে। কপালের রগদুটো ছিঁড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণায়।

হঠাৎ যেন অনেক বছরের ঘুম ভেঙে সে চেঁচিয়ে উঠল, এই! রোকো! বাজবাহাদুর, গাড়ি রোকো!

বাজবাহাদুর ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ব্রেকে চাপ দেয়! পাহাড়ি পথে ঝাঁকুনি খেয়ে স্থির হয়ে যায় ওদের গাড়িটা। ইঞ্জিনের শব্দ থেমে যেতেই চারপাশের জনহীন পরিবেশের নিস্তব্ধতা ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের ওপর।

কী হল? রোদেলা বিস্মিত। রেহানের এইভাবে গাড়িটা থামানোর কোনও যুক্তি সে খুঁজে পাচ্ছে না।

রেহান কেমন ঘোলাটে চোখে বলে, আচ্ছা, এইখানটায় বক্সা ফোর্ট না?

বাজবাহাদুর ঘাড় নাড়ে, জি। ইধারসে থোড়া পয়দল চলনা পড়েগা! লেকিন কুছ দেরমে শাম হোনেওয়ালা হ্যায় সারজি!

রেহান ততক্ষণে নেমে পড়েছে গাড়ি থেকে। বাজবাহাদুরের সাবধানবাণী যেন ওর কানেই যায়নি! নির্জন পায়ে হাঁটা পথে এগিয়ে চলেছে সে।

বাধ্য হয়ে রোদেলা আর বাজবাহাদুরও নেমে আসে গাড়ি থেকে। রোদেলা চেঁচায়, বাজবাহাদুর তো ঠিকই বলছে। রেহান, এই ভর সন্ধ্যেবেলা তুই বক্সা ফোর্টের দিকে চললি কেন? এখন তো সেভাবে কিছু দেখাও যাবে না।

কোথায় রেহান? সে ততক্ষণে অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়েছে।

রোদেলা অসহায় মুখে একবার বাজবাহাদুরের দিকে তাকায়। রেহানকে এখানে ফেলে চলে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বাধ্য হয়ে সেও হাঁটতে থাকে। কী যে হচ্ছে, কিছুই ও বুঝে উঠতে পারছে না! রেহান যেন খুব দ্রুত অচেনা হয়ে উঠছে।

বাজবাহাদুরও ওকে অনুসরণ করে।

শুকনো পাতার খচরমচরে সহসাই চারপাশের নির্জনতা খানখান হতে থাকে।

বক্সা ফোর্ট যে পর্যটকরা দেখতে আসেন, তাঁরা বেলাবেলি ফিরে যান কাছাকাছি সান্তালাবাড়িতে। এখন পড়ন্ত বিকেলে তাই এ পথ জনশূন্য।

দূরের পাহাড়ে কুয়াশা মাখামাখি হয়ে রয়েছে। মেঘের চাদর যেন পরম আদরে জড়িয়ে রেখেছে উঁচু গাছগুলোকে। সূর্যের আলো কমে এসেছে। যে-কোনও মুহূর্তে অন্ধকার নেমে আসবে। আঁকাবাঁকা এবড়োখেবড়ো পথে আলোআঁধারি যেন লুকোচুরি খেলতে থাকে।

রোদেলা বিরক্তমুখে হাঁটতে হাঁটতে আবার বলে ওঠে, তুই তো বললি, পানিঝোরা কটেজে গিয়ে কিছুক্ষণ থেকে আবার ফিরে যাবি। এখন এই বিকেলবেলা বক্সা ফোর্ট দেখতে ঢুকবি? ওদিকে যেতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে না?

রেহান এবারেও খুব নীচু গলায় বলে, আমাকে...আমাকে কে যেন ডাকছে রোদেলা! বারবার বলছে, বক্সা ফোর্টে যেতে।

মানে? কে ডাকছে তোকে?

রেহান উত্তর দেয় না। মরা মাছের মতো নিষ্প্রাণ চোখে হেঁটে যেতে থাকে।

বাজবাহাদুর মাথা নেড়ে গজগজ করতে থাকে, ইয়ে বাবু বহত জিদ্দি হ্যায় মেমসাব!

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যায় দুর্গের ভাঙাচোরা প্রবেশপথটা।

সবুজে ঢাকা বিশাল অঞ্চলে ইতিউতি ছড়ানো রয়েছে দুর্গের একেকটি অংশ। ওদিকে মাথার ওপরে উন্মুক্ত আকাশ কালো হয়ে এসেছে। যেন এখুনি ভেঙে পড়বে তীব্র গর্জনে। প্রবেশপথ পেরিয়ে দুর্গের মধ্যে ঢুকতেই খোলা আকাশের নীচে দুর্গটা চোখে পড়ে ওদের।

এতদূর চড়াইপথে এসে রোদেলা হাঁপাচ্ছিল। চারদিক শুনশান। সবুজ খোলা প্রাঙ্গণে যথেচ্ছভাবে গাছপালা পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠেছে, থাবা বসিয়েছে দুর্গের দেওয়ালে, পাঁচিলে।

রোদেলা ইতিহাসের ছাত্রী, বক্সা ফোর্টের ইতিহাস ওর কিছুটা হলেও তাই জানা। প্রায় দেড়শো বছর আগে ইংরেজরা ভুটানের রাজার থেকে এই দুর্গ দখল করেছিল। বাঁশের কেল্লাকে পরিণত করেছিল পাথরের দুর্গে। তারপর এখানে বানিয়েছিল কারাগার। খুব বিপজ্জনক অপরাধীদেরই এখানে পাঠানো হত।

তারপর থেকে অজস্র বিপ্লবীকে এখানে সহ্য করতে হয়েছে মর্মান্তিক অমানুষিক অত্যাচার। সেইসময় আন্দামানের কুখ্যাত সেলুলার জেলের সঙ্গে একই সঙ্গে উচ্চারিত হত বক্সা ফোর্টের নাম। কত তরুণ স্বাধীনতা সংগ্রামীকে যে এখানে জান্তব কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল, তার কোনও হিসেব নেই!

স্বাধীনতার পরে আবার বদলে যায় চিত্র। কমিউনিস্ট চীনের আগ্রাসন থেকে বাঁচতে তখন এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন বহু তিব্বতী বৌদ্ধ ভিক্ষুক। সেটা পঞ্চাশের দশক। আর তারও পরে সত্তরের দশকে নাকি নকশালদেরও এখানে বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

আশ্চর্য, ঐতিহাসিক দিক থেকে এত গুরুত্ব, তবু সেভাবে কোনও রক্ষণাবেক্ষণ নেই! ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে যেন মুছে গিয়েছে এই দুর্গ!

হঠাৎ কড় কড় কড়াৎ! কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়ল। রোদেলা আকস্মিকতায় শিউরে ওঠে। বলে ওঠে, রেহান, এখনি মনে হয় বৃষ্টি নামবে। খুব ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। প্লিস, চল, গাড়িতে গিয়ে উঠি।

বলতে বলতে ওর গলার স্বরটা কেঁপে গেল।

কিন্তু কোথায় রেহান? কোথায় বাজবাহাদুর? কেউই যে নেই ওর পাশে!

অথচ এখনি তো ওরা ছিল।

মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে, প্রবল তোড়ে সাদাটে হয়ে যাচ্ছে চারপাশ। তারই মধ্যে ও দেখতে পায়, কখন যেন সবুজ প্রাঙ্গণ পেরিয়ে গিয়েছে রেহান আর বাজবাহাদুর। দূরের এক ভাঙাচোরা অলিন্দের মধ্য দিয়ে এখন হেঁটে যাচ্ছে তারা।

আশ্চর্য তো! এই ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে কোথায় তড়িঘড়ি নীচে নেমে গাড়িতে উঠবে, তা না! ওরা ভেতরে ঢুকছে? ওই পানিঝোরা যাওয়ার পর থেকেই রেহান যেন অদ্ভুত অসংলগ্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু বাজবাহাদুরের আক্কেলটাই বা কেমন? এতক্ষণ রেহানের সমালোচনা করছিল, আর এখন নিজেই বৃষ্টির মধ্যে ওই ধ্বংসস্তূপের ভেতর ঢুকছে! সাপখোপ নিশ্চয়ই থিকথিক করছে। হিংস্র কোনও জানোয়ার থাকাও বিচিত্র নয়। চারপাশেই তো ঘন জঙ্গল।

রোদেলা একমুহূর্ত ইতস্তত করে। তারপর প্রাণপণ দৌড়তে থাকে বৃষ্টির মধ্যে।

অ্যাই? অ্যাই রেহান! ওদিকে কোথায় ঢুকলি? রোদেলা গলার শির ফুলিয়ে চেঁচাতে থাকে, বাজবাহাদুর? তুম কিউ উধার ঘুস রহে হো?

কিন্তু ততক্ষণে রেহান আর বাজবাহাদুর অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে ভাঙাচোরা সেই অলিন্দের ভেতরে। অলিন্দটার অধিকাংশ দেওয়ালই খসে পড়েছে। এখনও আস্ত রয়েছে কয়েকটা মাত্র ঘর। ঘর না সেগুলোকে খুপরি বলাই যুক্তিযুক্ত। ভেতরে আলো ঢোকে না বললেই চলে। জানলা তো দূর, একটা ঘুলঘুলিও নেই। এই খুপরিগুলোতেই আগে আটক করে রাখা হত বন্দীদের।

খুপরিগুলো পেরিয়ে একেবারে শেষে রয়েছে একটা কুয়ো। বহুকালের অব্যবহৃত! পরিত্যক্ত।

রোদেলার বুক ঢিবঢিব করছিল! ওর ষষ্ঠেন্দ্রিয় যেন জানান দিচ্ছিল আসন্ন কোনও ভয়ংকর ঘটনার। ওর মনের ভেতর থেকে কেউ বলছিল, পালাও! এখানে আর এক মুহূর্তও নয়!

কিন্তু ও কিছুতেই পালাতে পারছিল না। এক অদৃশ্য টানে পাগলের মতো উঁকি দিচ্ছিল একটার পর একটা খুপরিতে। বাইরের বৃষ্টি পেরিয়ে যে সামান্য দিনের আলো ঢুকছে, তার মধ্যেই আপ্রাণ চেষ্টা করছিল রেহান আর বাজবাহাদুরকে খুঁজতে।

এই তো একটা লম্বা অলিন্দ, ও আসার মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে ওরা ঢুকল এখানে। গেল কোথায়?

বাইরে বৃষ্টির সঙ্গে শুরু হয়েছে প্রচণ্ড ঝড়। ভীষণ জোরে বাতাস বয়ে চলেছে। দূরের গাছগুলো একেবারে নুয়ে পড়েও প্রাণপণ চেষ্টা করছে আবার মাথা তুলে দাঁড়ানোর। এত বিধ্বংসী ঝড়, অথচ কয়েক মুহূর্ত আগেও ছিল না তার ন্যূনতম পূর্বাভাষ!

পরপর খুপরিতে উঁকি দিতে দিতে রোদেলা পৌঁছে যায় একেবারে শেষটায়। সেখানে উঁকি দেওয়ামাত্র কেমন নিশ্চল হয়ে গেল। বৃষ্টিভেজা টি-শার্টে হঠাৎই কনকনে শুকনো শীত আঁকড়ে ধরে ওকে।

এই ঘরটায় অন্য খুপরিগুলোর মতো নিকষকালো অন্ধকার জমাট বাঁধেনি। আলোআঁধারি হলেও রোদেলা এখানে দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট।

কিন্তু এই ঘরের মধ্যে ছায়ার মতো কারা চলাফেরা করছে? নিঃশব্দ হলেও যেন বড় তীব্র তাদের অস্তিত্ব!

রোদেলা ভয়ে কাঁপতে থাকে। যাদের ও সামনে আবছা দেখতে পাচ্ছে, তারা যে কেউ জীবিত নয়, তা ওর অবচেতন স্পষ্ট জানান দিচ্ছে।

ওই তো রেহান দাঁড়িয়ে রয়েছে! কিন্তু রেহানের কাঁধের ওপর দুপাশে দুই পা ঝুলিয়ে বসে ও কে? মাথা যে প্রায় সিলিং ছুঁয়েছে। চোখের কোটর সম্পূর্ণ অন্ধকার! পরনে ঢোলা ডোরাকাটা জামা আর খাকি প্যান্ট।

পাশে আরেকটা ছেলেও ওই একই পোশাকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরোচ্ছে প্রবল রাগ আর অসম্ভব ঘৃণা।

রেহান ভাঙাগলায় বলছে, আমায়...আমায় ছেড়ে দে গঙ্গা! আমায় রেহাই দে কৃষ্ণ! আমি ভুল করেছি রে! খুব ভুল করেছি।

এখন আর এসব বকওয়াস করে কোনও লাভ নেই, নগেন। রোদেলাকে চমকে দিয়ে সম্পূর্ণ অচেনা গলায় বলে ওঠে একটু দূরে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকা বাজবাহাদুর।

আমার দাদাজি তেজবাহাদুর বহোত তকলিফ করেছিল। দিনের পর দিন আধপেটা খেয়ে বিদেশে থেকে টাকা জোগাড় করেছিল। সবাই মিলে একটা সুন্দর খোয়াব দেখেছিল। আর সেই স্বপ্নকে তুই ওইভাবে

চুরমার করে দিয়েছিলি? বিশ্বাসঘাতক! বেইমান! তুই জানিস কত অত্যাচার, কত নির্মমতার সাক্ষী এই দুর্গ! গর্জে উঠল বাজবাহাদুর।

রেহান ভয়ে কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ছে মাটিতে। আর বসে পড়ামাত্র রোদেলা দেখতে পাচ্ছে ওর পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন আরও তিনজন ভদ্রলোক।

ত^াঁদের মধ্যে দুজন যেন বড় বিব্রত! সামনে যে এত কিছু ঘটে যাচ্ছে, তাঁরা যেন দেখতেই পাচ্ছেন না। ছায়া ছায়া হয়ে একজন অন্যজনকে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলছেন, তোর দাদুকে এখানেই আটকে রেখেছিল, উৎপল?

উৎপল নামক দ্বিতীয় ভদ্রলোক বলছেন, হ্যাঁ। মাসের পর মাস। কী যে অকথ্য সেই অতাচার, ভাবতে পারবি না অতীন! তলপেটের অনেকটা মাংস কেটে নুন ডলে দেওয়া হত।

শুধু তাই? হিসহিসিয়ে কথা বলে ওঠে রেহানের কাঁধে চেপে থাকা ছেলেটা, পালানোর আগের দিন রবার্ট সাহেব তার কুকুর টেডিকে ছেড়ে দিয়েছিল আমার আর কৃষ্ণর ওপর। শরীরের নানা জায়গা খুবলে খেয়েছিল ওই পিশাচটা। ওই যে, ওই যে দ্যাখ...আসছে!

ছেলেটার ঘাড় আচমকা ঘুরে যায় এদিকে, তার আঙুল সোজা ওঠে রোদেলার দিকে।

রোদেলা হকচকিয়ে যায়। একি! ছেলেটা ওর দিকে আঙুল তুলছে কেন?

আঙুল অনুসরণ করতেই রোদেলার শিরদাঁড়া দিয়ে নেমে যায় বরফকুচি।

ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বিশাল জিভ চাটছে যে চতুষ্পদটা, সে কি কোনও কুকুর? অমন করালদর্শন কোনও পার্থিব প্রাণী হয়?

নাকি এ সাক্ষাৎ যমদূত? সোজা উঠে এসেছে নরক থেকে?

কুকুরটাকে দেখতে দেখতে রোদেলার চোখ পড়ে যায় নিজের ওপর। একি, ওর সাদামাটা জিনস রঙ বদলে ধপধপে সাদা গাউন হয়ে গেল কী করে! আর ওই ভয়ংকর কুকুরটাকে আদর করতে করতে ও কেন এগিয়ে যাচ্ছে?

রেহানের পেছনে এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা তৃতীয় ভদ্রলোক এবার হঠাৎই এগিয়ে আসতে থাকেন। পাশ থেকে উৎপল বলেন, আহ! সনাতন চৌবে আবার কোথায় চলল?

তৃতীয় ভদ্রলোক তাতে কর্ণপাত করেন না। এগিয়ে এসে দু-হাত বাড়িয়ে ঝকঝকে হেসে বলেন, ওহ মার্থা! ওয়েলকাম! টেডিকে সকাল থেকে না খাইয়ে রেখেছ তো? এই নেটিভগুলোকে এবার এক্সট্রিম পানিশমেন্ট না দিলেই নয়। বড্ড বেড়েছে।

রোদেলার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে সম্পূর্ণ অচেনা গলা, ইয়েস রবার্ট! টেডি ইজ সো হাংরি।

মার্থা? উৎপল যেন এতক্ষণে দেখতে পান রোদেলাকে। বলে ওঠেন, ও মার্থা কেন হবে? অতীন, তুই চিনতে পারছিস কল্পনাকে? সেই কল্পনা...যে আমাদের আন্দোলনের সময় সব গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছিল সরকারের কাছে?

বিলক্ষণ পারছি। ওই মুখ কি ভোলা যায়? কলেজ জীবনে আমরা দুজনে তো একসঙ্গেই জড়িয়েছিলাম নকশাল আন্দোলনে। চারু মজুমদার। কানু সান্যাল! উহ! আমাদের কত স্বপ্ন, কত আশা! অতীন বলে ওঠেন, কল্পনা, সুশীল আর সুশান্ত নকশাল করলেও শেষ মুহূর্তে গদ্দারি করেছিল। নকশালবাড়ি এসে আমাদের গোপন ডেরা জেনে নিয়ে গিয়ে ওই তিনজন জানিয়ে দিয়েছিল পুলিশকে। পুলিশের দেখানো ভালো চাকরির লোভ সামলাতে পারেনি। তারপর আমাদের কয়েকজনকে পুলিশ মারতে মারতে নিয়ে এসেছিল এই দুর্গে। নেহাত আমি আর তুই আগেরদিন পালিয়েছিলাম, তাই বেঁচে গিয়েছিলাম! আমি জানি, তুই এখনো চিনতে পারিসনি উৎপল। আমি কিন্তু চিনেছি সনাতন চৌবের আড়ালে আমাদের বিশ্বাসঘাতক সুশীলকে। আর ওই প্রাণভিক্ষা করা ছেলেটার আড়ালে আমাদের সুশান্তকে।

উৎপল সবিস্ময়ে বলে ওঠেন, ঠিক! ঠিক বলেছিস! আমার তাই চেনাচেনা লাগছিল! আশ্চর্য তো! সব বেইমানেরা কি আজ এক জায়গায়? ওই তো, ওই তো, জিতেন, স্বপন, মধু, ওরা এসে গেছে। ওদেরকেই তো তিলে তিলে মেরেছিল সেবার পুলিশ! মনে আছে তোর?

কিলবিল করতে থাকে আরও কিছু ছায়া। তাদের পরনে সত্তরের দশকের ঢলা প্যান্ট, জামা। প্রত্যেকের চোখের গর্তে মিশমিশ করছে কালো অন্ধকার! তাদের সবাইকে একসময় খুন করা হয়েছিল এই দুর্গে। বাইরের পৃথিবীর কেউ জানতে পারেনি সেই ভয়ংকর অন্যায়ের কথা। তারা সবাই এখন আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় রোদেলা, রেহান আর সনাতন চৌবের ওপর। কল্পনা! সুশীল! সুশান্ত! লজ্জা করে না তোদের? ওইভাবে ধরিয়ে দিয়েছিলি আমাদের?

যে একবার বিশ্বাসঘাতক, যে একবার প্রতারক, সে বারবার বিশ্বাসঘাতক, বারবার প্রতারক! ডোরাকাটা জামা পরা দ্বিতীয় ছেলেটি এবার হঠাৎ হাত তোলে শূন্যে। চিৎকার করে ওঠে দৃপ্ত শ্লোগান দেওয়ার ভঙ্গিতে।

অনেকদিন পর বাগে পেয়েছি! নগেন, রবার্ট, মার্থা! একশো বছর আগে যা শুরু হয়েছিল, তার পাইপয়সা হিসেব মেটানোর পালা এসেছে আজ! নিয়তিই টেনে এনেছে ওদের এখানে।

হ্যাঁ হ্যাঁ। সুশীল, সুশান্ত, কল্পনা! ওরা শেষ করে দিয়েছিল আমাদের সব পরিকল্পনাকে। ওদের খতম করতেই হবে!

ধীরে ধীরে গোটা ঘরটা ভরে উঠতে থাকে প্রচুর মানুষের গুঞ্জনে। বিভিন্ন সময়কালের অতৃপ্ত উপোসী আত্মারা যেন আলোড়ন তুলেছে ছোট্ট খুপরির মধ্যে।

রোদেলার দৃষ্টিশক্তি বারবার হারিয়ে যেতে থাকে। তবু তার মধ্যেই অনেক কষ্টে ও চোখ মেলে দেখে, যারা ধীরে ধীরে ভরিয়ে তুলছে ঘর, তারা কেউই মানুষ নয়! কেমন ছায়া-ছায়া অবয়ব। আর যাই হোক, তাদের নেই কোনও রক্তমাংসের শরীর।

তাদের কেউ একেবারে সিলিং থেকে উল্টো হয়ে ঝুলে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে দেখছে ওদের, কেউ হিমশীতল হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করছে ওদের কণ্ঠনালী! তীব্র আক্রোশে!

রোদেলা, রেহান আর সনাতন চৌবে হাঁটু গেঁড়ে বসে। ওদের মুখ নীচু। ছায়াময় অশরীরীরা কেউ প্রবল রাগে ছুঁড়ে দেয় একরাশ থুতু! কেউ নিজের শরীরের সর্বশক্তি একত্র করে কষাতে চায় লাথি! ভুলে যায়, একদিন ওদের দেহ থাকলেও আজ নেই। ভয়ানক প্রতিশোধস্পৃহা কোনও কথা শোনে না!

রোদেলার ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে নোনতা কী যেন গড়াতে থাকে। জিভ দিয়ে চাটে ও। রক্ত!

ওর ভেতর যেন বাস করছে অচেনা কেউ। সে উদগ্রীব হয়ে চারদিক খোঁজে। টেডি...টেডি কোথায় গেল?

ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে জড়ানো ইংরেজিতে কাতর আবেদন, ফরগিভ মি!

ফরগিভ? মানে মাফ? তোদের? বাজবাহাদুরের মতোই মঙ্গোলয়েড ধাঁচের আর এক ছায়ামুখ এগিয়ে আসে, কী বলেছিলি যেন? আমাকে ঝোলাবি, না গুলি করবি? নাকি টেডিকে দিয়ে খাওয়াবি?

নো-ও-ও! রোদেলা ককিয়ে ওঠে, ফরগিভ মি! প্লিজ!

প্রচণ্ড এক আঘাতে হঠাৎ জ্ঞান হারাতে থাকে ও। চেতনালোপের ঠিক আগের মুহূর্তে হিমচোখে দেখে, ওর পাশ থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রেহানকে। রেহান ছটফট করছে, প্রাণপণ চেষ্টা করছে আত্মরক্ষার, কিন্তু পারছে না। ওর চারপাশ ভরে গেছে অগণিত ছায়াময় অবয়বে।

অলিন্দের শেষপ্রান্তে যে গভীর কুয়োটা পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে রয়েছে, সেই কুয়োর একেবারে ধারে গিয়ে ওকে এখন দাঁড় করিয়েছে ছায়ামাখা অশরীরীরা!

বহুদূর থেকে অনেকে মিলে যেন হাঁটছে মিছিলে। চলছে শ্লোগানের কলরোল।

যে একবার বিশ্বাসঘাতক, যে একবার প্রতারক, সে বারবার বিশ্বাসঘাতক, বারবার প্রতারক!



অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

পঞ্চদশ পর্ব

ঘুম ভেঙে উঠে বসলাম। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কেউ। আস্তে আস্তে। কান খাড়া করে শুয়ে রইলাম। আবার খানিকক্ষণ শব্দ পেলাম না। হয়তো মনের ভুল।

একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখছিলাম। যেন বহুবছর কেটে গেছে স্বপ্নের মধ্যে। স্বপ্ন মাঝেমধ্যে বাস্তবের এত কাছাকাছি এসে নিঃশ্বাস ফেলে যে তখন আর আশেপাশের বাস্তবকে সত্যি বলে মনে হয় না।

উফ, কী সাংঘাতিক স্বপ্ন! স্বপ্নে দেখছিলাম উৎপল যেন কাকে ডেকে এনেছে কটেজে। কেয়ারটেকার। কী যেন নাম? সনাতন না কি যেন! কী আশ্চর্য, নামটা পর্যন্ত মনে আছে! তারপর আমরা ওই লোকটার সঙ্গে হেঁটে কটেজের বাইরে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গেলাম। এরপর যে কী হল? নাহ, কিছুই মনে পড়ছে না! এর পরের বাকি স্বপ্ন কোথায় হারিয়ে গেছে।

হ্যাঁ, সকাল থেকে আজ যা সব খেয়ে আছি, তার পরে এরকম সব স্বপ্ন দেখাই স্বাভাবিক।

উৎপল কোথায়? এখনও ফেরে নি? এত দেরি করছে কেন?

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। মাঝেমধ্যে দমকা হাওয়া। জানলা বন্ধ থাকলেও শোঁ-শোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে। কী কুক্ষণে যে এখানে এসেছিলাম! আর যে জোর করে নিয়ে এসেছিল, সেই ব্যাটা উৎপলও উধাও। কোনও পাত্তা নেই।

কিছু কথা মনে পড়ে গেল। একটা কমবয়েসি ছেলে আমাকে বলেছিল পালিয়ে যেতে। কারা যেন আমাদের তাড়া করেছিল। তাদের সঙ্গে একটা বিশাল কুকুরও ছিল। আমি পানিঝোরার জলে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলাম। ভাগ্যিস উৎপল হাত ধরে টেনে লাস্ট মোমেন্টে আটকেছিল। না হলে ওই ঝোরার জলে ভেসে যে কোথায় যেতাম, কে জানে!

ঘরের মধ্যে বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। ঘরের আলোর সুইচ অন করলাম, কিন্তু কোনও আলো জ্বলল না। ফোনটাও যে কোথায় গেল! ফোনে অবশ্য কোনও চার্জ নেই। পেলেও লাভ হত না। একটা প্লাগ পয়েন্ট খুঁজে বার করতেই হবে।

কেমন আছে মা, স্নিগ্ধা, রুবাই, পাপন? ক'দিন বাদেই রুবাইয়ের পরীক্ষা শুরু। নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে খুব দুশ্চিন্তা করছে। এখানে আটকে পড়েছি, এটুকু জানাতে পারলেও নিশ্চিন্ত হত।

চুপ করে বেশ খানিকক্ষণ বসে থাকলাম। অন্ধকারে চোখ খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে উঠছিল। বাইরেও যাওয়ার উপায় নেই। উৎপল বারবার করে বারণ করে গিয়েছিল এ ঘরের বাইরে যেতে। বলারই কথা। কী সব দেখে যেভাবে ঝোরার জলে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলাম, তাতে এটা বলা স্বাভাবিক। সত্যি কথা বলতে আমিও ঘরের বাইরে যেতে ভয় পাচ্ছি। মনে পড়ছে সেই ছেলেটার কথা। বারান্দায় দুটো পা যেভাবে বাতাসে ঝুলছিল! উফ, মনে পড়লেই এখনও হাত ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। এটা আমি নিশ্চিত যে এ-বাড়িতে কিছু একটা গন্ডগোল আছে।

বৃষ্টি ইতিমধ্যে কমে যাওয়ায় বাইরের ঝোরার শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

কালো মেঘ দূরে সরে যাচ্ছে। একটু একটু করে সামনে আসছে তারা ভরা আকাশ। বাইরে গাছের পাতার আড়াল থেকে উঁকি মারছে পূর্ণিমার চাঁদ। আজ পূর্ণিমা? কালই যেন খয়াটে চাঁদ দেখেছিলাম।

যাকগে, এ অন্ধকারে চাঁদের আলোর মতো ভালো সঙ্গী আর কেউ হতে পারে না। চাঁদের আলোয় যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে চারদিকের জঙ্গল আর পাহাড়ের ছায়াশরীর। জমাট বাঁধা কুয়াশা যেন সে বনে চাদর গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বাইরে থেকে আসা ক্ষীণ আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, আমার স্লিপিং-ব্যাগটা ঘরের একপাশে পড়ে আছে। কিন্তু তা জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে, যেন বহু বছরের পুরোনো। আমি এর মধ্যেই ঢুকে শুয়েছিলাম কালকে? নাকি?

একটা অস্বস্তি, দমবন্ধ করা ভয় শরীর অবশ করে ফেলল।

হঠাৎ চমকে উঠলাম। খানিক দূরে পাইন গাছের নীচে কে দাঁড়িয়ে আছে? শিকারের পোশাকে এক লাল চুল মেমসাহেব! পায়ে হান্টিং বুট। মেমসাহেব, এখানে এত রাতে? কোথায় যেন একে দেখেছি! ঝোড়ো হাওয়ায় তার চুল মুখের সামনে এসে পড়ছে। চুল সরিয়ে সে আমার দিকেই তাকাল। সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ঘৃণা আর রাগ-এর স্পষ্ট ছাপ।

কীরকম যেন অস্বস্তি হল। চোখ অন্যদিকে সরিয়ে ঘরের দিকে তাকালাম। চারদিকে শুধু মাকড়সার জাল আর ঝুল। ঘরের কাঠের দেওয়াল অযত্নে কালো হয়ে গেছে। একটা দেওয়াল আলমারি আছে ঘরে। ভারী বাহারি কাঠের কাজ তার উপরে। অযত্নে তার কিছু জায়গা ভেঙে কাঠ ঝুলছে। একদিনে যেন অনেক বয়স বেড়ে গেছে এ ঘরের।

জানলার দিকে আবার দেখতে গিয়ে হৃৎস্পন্দন যেন কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেল। সেই মহিলা হঠাৎ করে একেবারে সামনে এসে গেছে। এ বাংলোটা কিছু কাঠের খুঁটির উপরে দাঁড়িয়ে আছে। মাটি থেকে প্রায় ছয় ফুট উঁচুতে। জানলার ঠিক বাইরে নীচে সে মহিলা কীরকম যেন হিংস্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি দ্রুত বন্ধ জানলার সামনে থেকে সরে এলাম। ঠিক তার পরক্ষণেই একটা জোরালো হাওয়া এসে আছড়ে পড়ল জানলাটার উপরে! সশব্দে জানলা খুলে গেল। একটা ভীষণ ঠান্ডা হাওয়া হঠাৎ করে হানা দিল ঘরের ভিতরে।

উঁকি মেরে দেখলাম, জানলার বাইরে সে মহিলা আর নেই। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ।

দরজায় আবার ধাক্কার শব্দ শুরু হয়েছে! স্পষ্ট। তাহলে কি ওই মহিলা সামনের দরজায় এসে গেছে? নাকি উৎপল ফিরেছে?

একটু দ্বিধা নিয়ে দরজা খুলে দেখি, কোথায় উৎপল! এক লঙ-কোট পরা মাঝারি হাইটের স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় টুপি। হাতে একটা ছাতা।

আমাকে দেখে যেন একটু অবাক হয়ে বলে উঠলেন—কী অবস্থা দেখুন! আমার ড্রাইভার এখানে আমাকে নামিয়ে দিয়ে থাকতেই চাইল না। এমন দুর্নাম এ জায়গার। তা আপনি কি এখানকার কেয়ারটেকার?

না, না। আমি এখানে গতকাল বেড়াতে এসে আটকে গেছি। সঙ্গে আমার বন্ধুও আছে। এখনই এসে পড়বে।

আমার দিকে একবার তাকিয়ে ভদ্রলোক যেন একটু হতাশ হয়ে বলে উঠলেন—ধুর বাবা! এটা নাকি হন্টেড কটেজ। শুনেছিলাম গত কয়েক বছর এদিকে নাকি কেউ আসে না। তিনবছর আগে দুজন ভদ্রলোক এখানে এসে উধাও হয়ে যান। গতবছর আবার কয়েকজন এদিকে এসে হারিয়ে যায়। তারপরে আর কেউ এখানে আসে না। কে যে এসব ভুলভাল কথা রটায়?

একটু থেমে ফের বলে উঠলেন, আসলে অনেকক্ষেত্রে এসব সাজানো ঘটনাও হয়। হন্টেড করে রাখার অনেক সুবিধে থাকে।

কীরকম?

আসলে অনেক সময় এসবের আড়ালে নানানরকম অসামাজিক কাজকর্ম হয়। তা আপনারা এর খোঁজ পেলেন কী করে?

আমার বন্ধু এখানে কাছেই অডিট করতে এসেছিল। ও-ই এ জায়গাটার খবর আগে থেকে পেয়েছিল। তবে আমাদের অভিজ্ঞতা আপাতত বিশেষ ভালো নয়। সামান্য অদ্ভুত অভিজ্ঞতাও হয়েছে।

কীরকম?

বেশি কথা বলে ফেলছি কি? একদম অচেনা লোককে প্রথম আলাপে কি এসব বলা উচিত!

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ভদ্রলোক ফের বলে উঠলেন, আসলে ভূতুড়ে কটেজ দেখে বেড়ানোটা আমার একটা শখ। এত জায়গায় গেছি! কোথাও কিসসু দেখিনি। সব ননসেন্স! আমার এক বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম, এটার নাকি বেশ ভালোরকম কুখ্যাতি আছে। তো সেটা দেখতেই আসা। তা আপনার বন্ধু কি অন্য ঘরে আছে? তাহলে তো থাকার একটু সমস্যা হবে।

না, না, কিচ্ছু সমস্যা হবে না। বরঞ্চ একসঙ্গে ভালো গল্পগুজব করা যাবে। এ যা জায়গা! মাঝেমধ্যে মনে হয় নিজের নিশ্বাসও শুনতে পাচ্ছি। দু-এক দিন থাকতেই হবে। সাঁকো মেরামত পর্যন্ত।

সাঁকো? কোন সাঁকোর কথা বলছেন?

কেন? এর সামনের সাঁকোটা? আপনি কী করে এলেন?

বলতে বলতে সামনের দিকে তাকিয়ে অবাক হলাম। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখছি সামনের সাঁকো ঠিকই আছে। সাঁকোটা তাহলে কি এরমধ্যেই সারানো হয়ে গেছে! অথচ আমি টেরও পেলাম না।

কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলাম। একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ আসছে পাশের ঘর থেকে। ওই ভদ্রলোকও শুনেছেন।

কীসের আওয়াজ বলুন তো?

পাশের ঘরটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। হ্যাঁ, ঘরের ভেতর থেকে গোঙানির শব্দ আসছে।

দরজা বন্ধ। ধাক্কা দিলাম! খুলছে না।

দুজনে মিলে এবারে সজোরে ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। আর যেন সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উপরে হিংস্র শ্বাপদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘন অন্ধকার আর পচা একটা গন্ধ! কিন্তু ঘরে কেউ নেই।

ঘরে ঢুকেই ডানদিকে সুইচবোর্ড। আলোর সুইচ অন করলাম। আশ্চর্য ব্যাপার, কোনও আলো জ্বলল না। তাহলে কি এখানে এখন লোডশেডিং? যাই হোক, কোথা থেকে আওয়াজ আসছে বোঝার চেষ্টা করলাম।

অন্ধকারে চোখ একটু অভ্যস্ত হয়ে উঠতেই চমকে উঠলাম। সামনের জমাট বাঁধা অন্ধকার যেন কারো চেহারার ছদ্মবেশ নিয়ে শুয়ে আছে। সে অন্ধকার আমার চোখের সামনে আস্তে আস্তে উঠে বসল।

কী? কী ওটা? পাশের ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন।

আমি অবশ্য একে চিনি। এ সেই খাকি হাফপ্যান্ট পরা ছেলেটা। খালি গা। সারা গায়ে চাবুকের ক্ষতচিহ্ন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ছেলেটা যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

মনে হল, পাদুটো যেন কেউ কাঠের মেঝেতে গেঁথে দিয়েছে।

ছেলেটা আমাকে লক্ষ্য করে ক্ষীণকণ্ঠে বলে উঠল কৃষ্ণ, পালিয়ে যা! আবার আসবে ওরা। ওই কুকুরটা সারা গায়ে কামড় বসিয়েছে। পেটের মাংস খুবলে নিয়েছে। আর পারলাম না রে, পারলাম না! স্বাধীন দেশ দেখে যেতে পারলাম না। পারলে আমার মাকে একটা খবর দিস।

মেঝেতে বসে পড়লাম। ওকে জড়িয়ে ধরে এক অচেনা কণ্ঠে বলে উঠলাম, না রে গঙ্গা, আর না! এইবার বদলা নিতেই হইব।

ও মশাই, কী বলছেন? কী হল আবার?

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ফের তাকালাম। সামনের ঘরে কেউ নেই। আমি একা মেঝেতে বসে আছি। অস্বস্তির সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম।

নিজের মনে মনে বলে উঠলাম, কী সব যে হচ্ছে এখানে!

ভদ্রলোক আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, কী করে যে এখানে আছেন গতকাল থেকে, কে জানে! যা অবস্থা। মনে হয় না, এখানে গত দু-বছরে কেউ ছিল। সব কিছুর উপরে পুরু ধুলো। আমিও তো সেরকমই শুনেছিলাম। আপনাকে দেখে সেজন্যেই এত অবাক হয়েছিলাম।

আবার একটা শিরশিরে অনুভূতি হল। সামনের দিকে তাকিয়ে।

কাল বাংলোর সামনে সবুজ ঘাসের চাদর ছিল। এখন সেখানে শুধুই ঝোপ আর আগাছা। জঙ্গল যেন আরও কাছে চলে এসেছে। আমি নিশ্চিত, কাল এরকম ঝোপের মধ্যে দিয়ে আমরা আসিনি। তাহলে?

বাইরে এখন বেশ ছমছমে অন্ধকার। বাংলোর সামনের যেটুকু জায়গা চাঁদের আলোর বদান্যতা পেয়েছে, তার বাইরে চারদিকে রহস্যময় অন্ধকার। কেউ যেন সামনে চুপ করে বসে আরও গভীর অন্ধকারের অপেক্ষায় আছে! তখনই হয়তো আমাদের সামনে আসবে।

সত্যি বলতে কি, এর মধ্যে যদি হঠাৎ করে ওই মেমসাহেব সামনে এসে উদয় হয়, তাহলে কী অবস্থা হবে, ভেবেই ভয় পাচ্ছিলাম। বারান্দার আলো জ্বালার চেষ্টা করলাম। কোনও আলো জ্বলল না। তাতে অবশ্য আমার অন্তত কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। চোখ অন্ধকারে সয়ে গেছে।

বারান্দায় কয়েকটা ভাঙা কাঠের চেয়ার ছিল। আমরা দুজনে তার মধ্যে দুটো সামান্য পরিষ্কার করে নিয়ে বসলাম।

ভদ্রলোক বলে উঠলেন, বুঝলেন, আমি অবশ্য শুধু ভূত দেখতে আসিনি। ছোটবেলা থেকে আমার উপরে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটা বড় ইনফ্লুয়েন্স ছিল, যাকে সবাই বাঘা যতীন বলে চেনে। আজ অবশ্য কেউ ওনার কথা মনে রাখেনি। নাম জিগ্যেস করে দেখবেন, মেট্রো স্টেশন দেখিয়ে দেবে! এই তো আমাদের অবস্থা।

একটু থেমে ফের বলে উঠলেন, আমরা চুপ করে এই লালমুখো ইংরেজদের অত্যাচার সহ্য করে গেছি। ওই একটা ছোট আইল্যান্ড থেকে আসা সামান্য কিছু লোক, তাদের কাছে আমরা এতবছর মাথা নিচু করে সব অন্যায়, অপমান, অত্যাচার সহ্য করে গেছি।

সেখানে ভাবুন তো বাঘা যতীনের কথা! ভদ্রলোক বলে চলেন, একদিকে চার্লস টেগার্ট, কমান্ডার রাদারফোর্ড, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিলভি ও হাজার হাজার সশস্ত্র পুলিশ! অন্যদিকে, বাঘা যতীনের নেতৃত্বে মোট পাঁচজন। তাও যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল শেষ অব্দি। কী সাহস, কী দেশপ্রেম ভাবুন তো! এই রবার্ট সাহেবের বাংলো! ভাবলেই রক্ত জ্বলে ওঠে। কত অত্যাচার যে হয়েছে এখানে! শুনেছি কয়েদিদের হাতের আর পায়ের হাড় হাতুড়ি দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হত। নখ উপড়ে নেওয়া হত। মেরে চোয়ালের হাড় ভেঙে দিত। চামড়া কেটে-কেটে নিত। আরও কত কী!

ভদ্রলোকের কথার মাঝে বাধা এল। দূর থেকে শিসের শব্দ শুনতে পেলাম। এ নির্ঘাত উৎপল! শিস দিতে দিতে এদিকে আসছে। এর মধ্যেও কেউ এরকম শিস দিতে পারে! আনন্দে উঠে দাঁড়ালাম। কোথায় ছিল এতক্ষণ! দূরে কিছু অজানা রাতপাখির ডানাঝাপটানির শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

ওই তো সামনের ঝোপঝাড় পেরিয়ে উৎপল আসছে। সঙ্গে প্রায় আমাদের সমবয়সি একটা ছেলে। সঙ্গে বছর পঁচিশেকের এক যুবতী।

মনে পড়ল, দুজনকেই আগে দেখেছি। স্বপ্নে এসেছিল। নাম রেহান আর রোদেলা। আশ্চর্য! স্বপ্ন এতটা সত্যি হয়? নাকি আমি আগে কোথাও ওদের দেখেছি? ওরা আবার একসঙ্গে কোথায় গিয়েছিল?

ওদের সবাইকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। শুধু আমার পাশের ভদ্রলোককেই কেন জানি অস্পষ্ট দেখছি!

কিন্তু শুধু যে ওরাই আসছে, তা নয়। ওদের পিছু পিছু যেন কুকুরের গম্ভীর গলার ডাক এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে বেশ কয়েকটা ভারী বুটের শব্দ। ভেসে আসছে পুলিসের হুইসেলের আওয়াজ।

কারা যেন ঘিরে ধরছে আমাদের চারদিক দিয়ে।

মনের মধ্যে কে যেন আবার বলে উঠল, কৃষ্ণ! এবার আমাদের প্রতিশোধ নিতেই হবে। আমরা আর পালাব না। দু'শো বছর ধরে ওদের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছি। আমরা আমাদের স্বাধীনতা ভিক্ষা চাই না! এটা আমাদের অধিকার।

না! আর ভয় নেই! এই বুনো মাটির গন্ধ এখন আমার সারা শরীরে।

কী কী হচ্ছে এসব? এরা কারা? চারিদিকে কিসের শব্দ? চিৎকার করে উঠলেন পাশের ভদ্রলোক।

সারা শরীর উত্তেজনায় যেন কাঁপছে। কে যেন আমার ভিতর থেকে চেঁচিয়ে বলে উঠল, ক্যান? আপনি কইতাসিলেন না যে আমরা চুপ কইরা এতোগুলান বচ্ছর অনেক অত্যাচার সহ্য করসি! আইজ থিক্কা হেই ইতিহাস পাল্টাইব। শোনেন, আর ভয় নাই!

আমি আবার চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, 'বন্দেমাতরম'। সে আওয়াজ আশেপাশের পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল।

পাশের ভদ্রলোক আচমকা যেন পাল্টে গেলেন। গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, ঠিক। আর পালানো নয়। যুদ্ধ করে আমরা মরব। তাতেই দেশ জাগবে।

অবাক হয়ে তাকালাম ওঁর দিকে। কোথায় যেন শুনেছি ঠিক একই কথা।



হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

অন্তিম পর্ব

'আর পালানো নয়। যুদ্ধ করে আমরা মরব। তাতেই দেশ জাগবে।'

হ্যাঁ, কথাটা যেন আগে কোথাও শুনেছি। মনে পড়েও মনে পড়ছে না!

লোকটা আমার অবস্থা অনুমান করে বলল, এটা বাঘা যতীনের বলা কথা! কৃষ্ণ তোমার মনে পড়ে, যুগান্তর সমিতির যে সভাতে আমি, তুমি, গঙ্গা মিলিত হয়েছিলাম, যে সভাতেও আমরা বাঘা যতীনের বলে যাওয়া এই কথা বলেই শপথ নিয়েছিলাম। কথাটা বলে লোকটা আমার মুখের দিকে তাকাল প্রত্যুত্তরের আশায়।

ভদ্রলোকের কথায় এবার আমার যেন মনে হতে লাগল, এ লোকটা তো আমার অচেনা নয়। আমি চিনি একে!

সে এরপর বলল, তোমার সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা। আমি চলে গেছিলাম ঢাকাতে অনুশীলন সমিতির কাজে আর তোমরা কলকাতা রয়ে গেলে যুগান্তরের কাজে। আর এর কিছুদিনের মধ্যেই ধরা পড়ে গেলে তোমরা। তোমাদের রাখা হল বক্সা জেলে। তারপর তোমরা জেল ভেঙেও পালালে...।

তার কথাগুলো শুনতে শুনতেই আমার স্মৃতির ওপর থেকে কুয়াশার চাদরটা যেন সরে গেল। আমি তার উদ্দেশে বলে উঠলাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনি অনুশীলন সমিতির ফণীবাবু! আমাদের অস্ত্র সাপ্লাই দিতেন।

তিনি প্রথমে বললেন, যাক! চিনতে পেরেছ তাহলে। আমি এই জন্মেও কিন্তু জাতীয় পতাকা সঙ্গে নিয়ে ঘুরি। অবশ্য এজন্মে আমার নাম ননীগোপাল। তোমার তো শুনেছিলাম কালাপানি হয়েছিল! তবে আমার সঙ্গে কিন্তু জেল ভেঙে বেরোবার পরে গঙ্গার দেখা হয়েছিল।

আমরা খোঁজ পেয়েছিলাম, গঙ্গা ধরা পড়ার পর তাকে এই রবার্ট সাহেবের কটেজে আনা হয়েছে অত্যাচারের জন্য। ফণীবাবু বলে চলেন, সমিতির নির্দেশে আমিও এসে উপস্থিত হলাম সেখানে। দূর থেকে দেখলাম, একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে শিকল দিয়ে কুকুরের মতো বেঁধে রাখা হয়েছে গঙ্গাকে। আমি স্থির করলাম রাতের অন্ধকারে সাহেব-মেমরা যখন কটেজের ভিতর ঘুমিয়ে পড়বে তখন আমি মুক্ত করার চেষ্টা করব ওকে।

ফণীবাবু মনে হয় আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ঠিক সেইসময় বাইরে থেকে কুকুরের ডাক ভেসে এল। গজরানোর মতো কুকুরের ডাকের শব্দটা যেন জঙ্গলের দিক থেকে গড়াতে গড়াতে এগিয়ে আসছে কটেজের দিকে!

সেই গর্জন শুনে ফণীবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, আরে! ওই তো সেই রবার্ট সাহেবের ভয়ংকর কুকুরটার ডাক! বিপ্লবীদের টাটকা রক্ত যাকে দিয়ে চাটানো হত। ওর জন্যই তো আমি শেষপর্যন্ত গঙ্গার কাছে পৌঁছতে পারিনি। রবার্ট আর মার্থা কটেজে ঢুকে যাবার পর গঙ্গার পাহারায় ছিল দানব কুকুরটা। চাঁদের আলোয় আমি গঙ্গার দিকে এগোতে যেতেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ঘাড়ে। আমি রিভলভার বার করারও সময় পাইনি।

আমি বলে উঠলাম, কিন্তু কুকুরটা তো আবার এদিকেই আসছে!

ফণীবাবু উত্তেজিতভাবে বললেন, হ্যাঁ, এদিকেই আসছে! একমাত্র ওর অবয়বটাই সত্যি। যুগ যুগ ধরে ও মানুষের রক্ত পান করে বেঁচে আছে।...না, ঠিক বেঁচেও নেই! কথাগুলো বলতে বলতে ফণীবাবু তার কোমর থেকে একটা রিভলবার টেনে বার করলেন।

বিস্মিত, ভয়ার্ত কণ্ঠস্বরে আমি বললাম, বেঁচে আছে...অথচ বেঁচে নেই! মানে?

তিনি জবাব দিলেন, ও হল ওয়ার উলফ বা ভ্যাম্পায়ার ক্যাটের মতো প্রাণী। মৃত, অথচ শরীরটা জীবিত থাকে রক্তপানের জন্য। তবে ধর্মের কল একদিন বাতাসে নড়ে ছিল। রক্তের সন্ধানে ও একদিন ঝাঁপ দিয়ে টুটি ছিঁড়ে ফেলেছিল রবার্টের, তারপর মার্থার! তবে এবার ওর খেলা শেষ হবে। ও আসছে!

ফণীবাবুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে থেকে উৎপলের ভয়ার্ত চিৎকার শোনা গেল হ্যাঁ, আসছে! ওরা এসে পড়েছে!

কথাগুলো বলে দুড়দাড় করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল উৎপল।

আর এর পরই গজরানির শব্দটা ঝোরার দিক থেকে বারান্দায় উঠে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল। সেই বিশাল কালো লোমশ কুকুরটা! রবার্ট সাহেবের কুকুর।

খোলা জানলা দিয়ে একফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে প্রাণীটার মুখে। হিংস্র ঝকঝকে দাঁতগুলো থেকে লালা চুঁইয়ে পড়ছে রক্তের লোভে। ভাঁটার মতো জ্বলছে প্রাণীটার চোখ দুটো।

তার দিকে তাকিয়ে হিম হয়ে গেল আমার শরীর। তারপরেই দরজার পর্দা সরিয়ে কুকুরটার ঠিক পিছনে এসে দাঁড়াল সস্ত্রীক রবার্ট সাহেব। তাদের চোখগুলোও যেন তার পোষ্যর মতোই জ্বলছে।

ফণীবাবুকে দেখে মার্থা পিশাচিনীর মতো খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, ব্লাডি নেটিভটা না? যে জেল পালানো গঙ্গাকে রাতের অন্ধকারে মুক্ত করতে এসেছিল। তারপর আমাদের আদরের ওর কুকুরটা ঘাড় ভেঙে রক্ত খেয়েছিল?

রবার্ট বলল, হ্যাঁ, ওই লোকটাই! কিন্তু এবার কাকে মুক্ত করতে এসেছ?

রবার্টের গলায় স্পষ্ট ব্যঙ্গের সুর।

কিন্তু ফণীবাবুর কণ্ঠস্বরে কোনও ভয়ের আভাস দেখা গেল না। বেশ দৃঢ় স্বরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, মুক্ত করতে এসেছি। আমি তোমাদের কবল থেকে মুক্ত করতে এসেছি এই সুন্দর জায়গাটাকে! আমি মারতে এসেছি তোমাদের কুকুরটাকে! যার টানে তোমরা এখনও এখানে রয়ে গেছ। ধন্য তোমাদের সারমেয় প্রেম, শয়তান প্রেম! কুকুরটাকে মারলে ওর একশো বছরের পুরোনো দেহটা মুহূর্তের মধ্যে পচে গলে ধুলো হয়ে যাবে। আর তার সঙ্গে তোমরাও হারিয়ে যাবে।

কথাটা শুনেই আবারও কুৎসিতভাবে হেসে উঠল শ্বেতাঙ্গী। ফণীবাবুর উদ্দেশে ঘৃণাভরে সে বলল, কীভাবে তুই ওকে মারবি? তোর ঘাড় তো কুকুরটা কবেই মটকে গরম রক্ত পান করেছে!

আমার যেন মনে হল, মেমসাহেবের কথা শুনে হাসলেন অকুতোভয় বিপ্লবী ফণীবাবু। শীতল কণ্ঠে তিনি বললেন, হ্যাঁ, মারতে পারব। জন্মান্তরবাদ বলে একটা কথা আছে জানো? মানুষ আবার নতুন দেহ নিয়ে জন্মায়। সে দেহ নিয়েই আমি এসেছি পূর্বজন্মের প্রতিশোধ নিতে! আমার এই দেহটা সত্যি।

বলেই তিনি রিভলভারটা তাক করলেন কুকুরটার দিকে।

মুহূর্তের মধ্যে ফ্যাকাসে হয়ে গেল রবার্ট আর তার স্ত্রীর মুখটা। রবার্ট আর তার স্ত্রী ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠল, না, না! গুলি কোরো না, গুলি কোরো না!

ফণীবাবু কোনও জবাব দিলেন না। মুহূর্তে গুলি চালিয়ে দিলেন কুকুরটাকে লক্ষ্য করে। আগুনের ঝলক আর প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল ঘরটা! গুলির শব্দ, কুকুরের গর্জন আর তার সঙ্গে রবার্ট আর তার মেমসাহেবের চিৎকারে মুহূর্তের জন্য একটা নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হল পানিঝোরা কটেজে।

কুকুরটা প্রথমে গুলি খেয়ে ছিটকে পড়লেও শেষবারের মতো একবার উঠে দাঁড়িয়ে ঝাঁপ দিল ফণীবাবুকে লক্ষ্য করে। বিশাল কুকুরটা আর ফণীবাবু তালগোল পাকিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। সেই অবস্থাতেই ফণীবাবু বারকয়েক গুলি চালালেন!

এবার সত্যিই থরথর করে কাঁপতে শুরু করল ঘরটা। আমি এতক্ষণ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ পাশ থেকে উৎপলের চিৎকারে হুঁশ ফিরল আমার।

কটেজটা ধসে পড়ছে! লাফ দে, লাফ দে জানলা দিয়ে!

কথাগুলো বলেই উৎপল লাফ দিল খোলা জানলা দিয়ে। আর আমিও সম্বিৎ ফিরে পেয়ে অনুসরণ করলাম উৎপলকে, লাফ দিলাম জানলার বাইরে!

উৎপল বলে উঠল, পালাতে হবে আমাদের।

আমি মাটি থেকে উঠে কয়েক-পা এগোতে না এগোতেই আমাদের পিছনে প্রচণ্ড শব্দ করে ধসে পড়ল রবার্ট সাহেবের পানিঝোরা কটেজ।

তবে পালানো আমাদের হল না। চারপাশ থেকে যেন ছুটে আসছে অসংখ্য ভারী বুটের শব্দ! তবে কি রবার্ট সাহেবের পুলিশ বাহিনী আমাদের ধরতে আসছে?

আমরা কোনওরকমে ছুটে গিয়ে খাদের কিনারে একটা ঝোপের আড়ালে বসে পড়লাম। হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়া কটেজটার চারপাশে তখন অনেক বুট পরা পায়ের শব্দ।

সেই শব্দ শুনতে শুনতে আমি ভাবতে থাকলাম, আমি একই সঙ্গে কৃষ্ণ চক্রবর্তী আর অতীন কীভাবে হব? তবে কি ফণীবাবুর মতো আমারও পুনর্জন্ম হয়েছে? বর্তমানের আমিই কি অতীতের সেই কৃষ্ণ?

ঝোপের আড়ালে বসে থাকতে থাকতেই একসময় অন্ধকার ফিকে হয়ে এল। ভোরের প্রথম আলো ছড়িয়ে পড়ল চারিপাশে। ঝোপের আড়াল থেকে আমি উঁকি দিয়ে দেখলাম, হ্যাঁ, কটেজটা ধসে পড়েছে। আর তাকে ঘিরে পুলিশ আর বেশ কিছু লোকজনের ভিড়। কটেজটা ধসে পড়াতে তার ওপাশটাও দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওই তো একটা বেশ বড় নতুন লোহার সাঁকো তৈরি হয়েছে বয়ে চলা জলের ওপর।

সাঁকোর ওপাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকটা পুলিশের গাড়ি, এমন কি একটা অ্যাম্বুলেন্সও। আরে! ওই তো একটা পুলিশের গাড়ির গায়ে 'পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ' লেখাটাও দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি!

মুহূর্তের মধ্যে আমার সব ভয়, হতাশা দূর হয়ে গেল। আমি উৎপলকে বললাম, আরে! ওরা ব্রিটিশ পুলিশ নয়! হয়তো আমরা এ ক'দিন কোনও ঘোরের মধ্যে ছিলাম। ওই দ্যাখ, আমাদের পুলিশ এসেছে। সম্ভবত আমাদেরই খোঁজ করতে এসেছে। চল, চল...।

আমার কথা শুনে উৎপল উৎফুল্লভাবে বলল, হ্যাঁ, চল, চল। বাঁচলাম তাহলে। নতুন ব্রিজও তৈরি হয়েছে দেখছি।

ঝোপের বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। গিয়ে হাজির হলাম মাটিতে শুয়ে পড়া কটেজটার কাছে। তবে প্রথমেই একটা মর্মান্তিক দৃশ্য চোখে পড়ল আমার। ননীগোপালের নিথর দেহটা কটেজের ধ্বংস স্তূপের থেকে বার করে এনে একপাশে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তাঁর থ্যাতলানো দেহটা দেখে মনে হল, বাড়িটা ধসে পড়ার কারণেই, কড়ি-বরগা, ছাদ ইত্যাদি চাপা পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার কটেজটার তদারকি করছিলেন। ভিড় ঠেলে তার কাছে দাঁড়ালাম আমরা। পুলিশ অফিসারের উদ্দেশে উৎপল বলল, অফিসার! আমি উৎপল, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। আমি আর আমার বন্ধু এই অতীন এখানে এসে আটকে পড়েছিলাম।

আমি বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঝোরার জলে ব্রিজটা ভেসে যাওয়াতে আটকে গেছিলাম এখানে। আর এখানে থাকতে থাকতেই মনে হয় আমরা পাগল হয়ে গেছিলাম। কত রকম দুঃস্বপ্ন দেখেছি, জানেন!

পুলিশ অফিসার আমার কথা যেন শুনতেই পেলেন না! অফিসারের ঠিক পাশেই কোট-টাই পরা আরও একজন হোমরাচোমরা গোছের লোক দাঁড়িয়েছিলেন।

পুলিশ অফিসার তার উদ্দেশে বললেন, বুঝলেন ডি.এম স্যার, রাতে আমি পেট্রোলিং-এর জন্য বেরিয়েছিলাম। পথে দেখা এই মৃত লোকটার গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে। যখনই সে আমাকে বলল, ননীগোপাল নামে এক ভদ্রলোককে পানিঝোরার সামনে নামিয়ে দিয়েছে, আর লোকটা নাকি ভূত খুঁজতে পানিঝোরা কটেজে গেছে—অমনি আমি রওনা হলাম এদিকে। কারণ, কয়েকবছর ধরে বেশ কয়েকজন

লোক এদিকে এসে নিখোঁজ হয়েছে বলে পুলিশ ফাইলে রেকর্ড আছে। তবে অদ্ভুত ব্যাপার কী জানেন স্যার, আমি ওপারে সাঁকোটার কাছে থামতে না থামতেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল বাড়িটা!

আমি বললাম, আমরা দু'জনও বাড়িটার মধ্যেই ছিলাম। কোনওরকমে বাইরে বেরিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছি।

কিন্তু এবারও আমার কথায় সেই পুলিশ অফিসার বা অন্য কেউ পাত্তা দিল না!

পুলিশ অফিসারের কথা শুনে ডি. এম. সাহেব বললেন, ধ্বংসস্তূপটা ভালো করে খুঁজে দেখা দরকার। একটা লাশ যখন পাওয়া গেছে, তখন আরও কেউ চাপা পড়ে থাকতে পারে এখানে ওখানে। আপনি জায়গাটা ভালো করে খুঁজে আমাকে রিপোর্ট করবেন।

বলে গাড়িতে উঠে পড়লেন।

ডি.এম সাহেব চলে যাবার পর তার নির্দেশ পালনের জন্য পুলিশ কর্মীরা নেমে পড়ল ভেঙে পড়া কটেজের কাঠের পাটাতন, কড়ি-বরগা ইত্যাদি সরানোর কাজে। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রথমে একটা কঙ্কাল উদ্ধার করল তারা। ক্যামেরার ব্যাগের নাইলনের স্ট্র্যাপ তখনও তার গলাতে জড়ানো! আমি সেটা দেখে উৎপলকে বললাম, আরে, এ যে সেই ফটোগ্রাফার ছেলেটা!

একটা কঙ্কাল উদ্ধার হতেই নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করল লোকগুলো। দ্বিতীয় যে কঙ্কালটা বেরিয়ে এল, তার দেহে লেগে থাকা পোশাকের টুকরো দেখে আমার সেটা নারীর কঙ্কাল বলেই মনে হল! কঙ্কালটা সম্ভবত মার্থার।

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে এল প্রায় চূর্ণ হয়ে যাওয়া দেহাংশ। সেটা দেখেই উৎপল আমার কাঁধ খামচে ধরল। কঙ্কালটার পায়ে তখনও পরা আছে লাল রঙের স্নিকার। আরে, আমরাই তো দু-জোড়া স্নিকার শিলিগুড়ি মার্কেট থেকে কিনে পায়ে দিয়েছিলাম! উৎপলেরটা লাল, আমারটা নীল।

আমি এবার কাঁপতে শুরু করলাম পরবর্তী দৃশ্যের জন্য! প্রত্যাশামতোই কিছুক্ষণের মধ্যেই উদ্ধার হল আরও একটি কঙ্কাল। তার পায়ে পরানো আছে একটা নীল স্নিকার। হ্যাঁ, ওটা আমারই জুতো!

আমার আর উৎপলের দেহ ভেদ করেই পুলিশ কর্মীরা কঙ্কালগুলোকে নিয়ে গেল সাঁকো পেরিয়ে গাড়িতে ওঠাবার জন্য।

অনেকক্ষণ হল পুলিশের লোকেরা, কঙ্কালগুলো নিয়ে পানিঝোরা থেকে চলে গেছে। আমি আর উৎপল ঝোরার সামনে নিশ্চুপ হয়ে বসে ছিলাম। চারপাশে সবুজ বনানী। ঝোরার কলকল শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। নিজের মনের যাবতীয় দ্বন্দ্ব, শঙ্কা কাটিয়ে উঠেছি।

আমি বুঝতে পেরেছি আমিই উৎপল, আমিই কৃষ্ণ। না, আর আমার মনে কোনও ধোঁয়াশা নেই এ ব্যাপারে! হঠাৎই আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল খাকি হাফপ্যান্ট আর ডোরাকাটা জামা পরা ছেলেটা। তার মুখে হাসি। তাকে দেখে আমি আর উৎপল উঠে দাঁড়ালাম।

আমি আমার গত জন্মের সহযোদ্ধাকে চিনতে পারলেও উৎপল তাকে প্রশ্ন করল, তোমার আসল পরিচয় কী?

ছেলেটা হেসে জবাব দিল, আমি সেই লোক। বাড়ির পুরোনো ছবির অ্যালবামে যার ছবি দেখেছিলে। তোমার গঙ্গাদাদু!

উৎপল বলে উঠল, কী আনন্দ! তুমি সত্যিই গঙ্গাদাদু?

ঠিক এইসময় আর একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ও মশাইরা! গল্প করার সময় পরে অনেক পাবেন। আজ কী দিন খেয়াল আছে আপনাদের? পনেরোই আগস্ট! ভূত হই বা জন্মান্তর হোক, দেশপ্রেম আমাদের মন থেকে কখনও মুছবে না। এখানে পতাকা তোলার জন্য আমি সঙ্গে একটা পতাকা এনেছিলাম। সেটা এবার তোলা যাক।

কথাগুলো বলতে বলতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন ফণীবাবু ওরফে ননীগোপাল।

আমাদের মধ্যে এখন আর কোনও কষ্ট বা যন্ত্রণা নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই অত্যাচারী রবার্ট আর মার্থার কটেজের ধ্বংসস্তূপের ঠিক ওপরেই আমরা বসিয়ে ফেললাম পতাকাদণ্ড। গঙ্গা দড়ি ধরে টান দিতেই নির্মল সূর্যকিরণে পতপত করে উড়তে শুরু করল স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা।

ফণীবাবু উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরলেন,—'ভারত আমার ভারতবর্ষ, স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লভিয়া জনম, ধন্য হয়েছি ধন্য গো।'

আমরা গলা মেলালাম তাঁর সঙ্গে। আমাদের গানের সঙ্গে ছলছল শব্দে নাচতে থাকল পানিঝোরা।

